Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে বাধা সমূহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রুমানা খাতুন

রোলঃ 216022073

২৬ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সিরাত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রুমানা খাতুন

রোলঃ 216022073

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "সিরাত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রুমানা খাতুন, আইডিঃ 216022073 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সিরাত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

রুমানা খাতুন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৬ মে, ২০২৪ ইং

রুমানা খাতুন

আইডিঃ 216022073

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

সিরাত কি?..6

সিরাত চর্চার সূচনা করেন সাহাবায়ে কেরামঃ..6

সিরাত চর্চার ধারাবাহিকতাও অব্যাহত থাকবেঃ.......................................7

সিরাত চর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাঃ...7

আয়াত নাজিলের কারণঃ...8

প্রিয় নবীজী ছিলেন আল কুরআনের অবিকল প্রতিবিম্বঃ 9

নবীজির বংশ পরিচিত, জন্ম ও শৈশব:...9

বংশ পরিচিতি:...9

জন্ম ও শৈশবঃ 10

দুগ্ধ পান কালঃ 11

বক্ষ বিদারন : 12

আমেনার মৃত্যু :..13

দাদা ও চাচার তত্ত্বাবধানেঃ..13

নিকাহ বা বিবাহঃ 14

নবুয়ত প্রাপ্তের পূর্ববতী জীবন:..14

নবুওয়াতী লাভ ও প্রথম কুরআন নাযিলঃ..16

জিবরিল (আঃ)- এর আগমনঃ..16

ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগঃ 16

নবুওয়াতের প্রথম বছর:...17

নবুওয়াতের দ্বিতীয় বছর: 17

নবুওয়াতের তৃতীয় বছর: 17

নবুওয়াতের চতুর্থ বছর প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার:.....................................18

নবুওয়াতের পঞ্চম বছর সাহাবাদের হাবশা হিজরত:...................................18

নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছর হযরত ওমর (রা:) ইসলাম গ্রহণ:...19

নবুওয়াতের সপ্তম বছর বয়কট অবরুদ্ধ জীবন:...23

নবুওয়াতের অষ্টম বছর চন্দ্র দ্বিখন্ডীত করন: 23

নবুওয়াতের দশম বছর বয়কট হতে মুক্তি:..25

নবুওয়াতের একাদশ বছর মদিনায় ইসলাম:...25

নবুওয়াতের দ্বাদশ বছর মেরাজ:...25

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছর মদিনায় হিজরত:..27

রাসূল (সাঃ)- এর মাদানী জিন্দেগী: 27

মদীনায় হিজরতঃ...27

মাদানী জীবনঃ...28

স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও সংবিধান প্রণয়ন: 29

মক্কার সাথে বিরোধ ও যুদ্ধ: 29

মদীনার ইহুদিদের সাথে সম্পর্কঃ..30

হুদাইবিয়ার সন্ধিঃ...31

বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কদের কাছে পত্র প্রেরণঃ..32

প্রেরিত দূতগণের তালিকাঃ..32

মক্কা বিজয় : 33

মহানবী সাঃ এর বিদায় হজ্জের ভাষণঃ..34

মৃত্যুঃ 36

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য:.....................................37

নবীজির মুজেজা: 44

সিরাত কি?

সিরাত একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ নিয়মাবলী, জীবনযাপন পদ্ধতি, আচার ব্যবহার, জীবনচরিত ইত্যাদি। সাধারণ অর্থে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর আচার-আচরণ, জীবনযাপন প্রণালী তথা জীবনচরিতকে বোঝায়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মূল সিরাত হলো, তার বিশাল হাদিস ভান্ডার। তবে প্রাথমিক যুগের মনীষীদের মতে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সরাসরি অংশগ্রহণ করা যুদ্ধসমূহ এবং তাঁর প্রেরিত যুদ্ধাভিযানসমূহের সমষ্টিকে সিরাত বলে। বরং তাদের মতে সিরাত হলো, সিরাত, আদব, তাফসীর, আকাইদ ইত্যাদি আটটি বিদ্যার সমষ্টির নাম। সে হিসেবে সিরাত ইলমে হাদিসের একটি অংশ। তবে এখনকার সময়ের পন্ডিত মনীষীরা সিরাত বলতে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিতকে আখ্যায়িত করেছেন। -সীরাতে মুস্তফা (সা.) : আল্লামা ইদরিস কান্ধলবী (রহ.)

সিরাত চর্চার সূচনা করেন সাহাবায়ে কেরামঃ

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সিরাত সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম অনুভব করেন সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুম ও শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ীগণ রহমাতুল্লাহি আলাইহিম। তারা সাহাবাদের জীবদ্দশাতেই দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিয়ে যুবক, বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকের কাছ থেকে অনুসন্ধান চালিয়ে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর প্রতিটি বাণী, কাজকর্ম এমনকি প্রিয় নবীজী সম্পর্কিত প্রতিটি ঘটনা পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করে পরবর্তীদের জন্য সংরক্ষন করে গেছেন। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর একেবারে সূচনার দিকে হাদিস গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু হলে তখন থেকে বেগবান হয় সিরাতের ব্যাপক অনুসন্ধান ও চর্চা। এ ক্ষেত্রে উমর বিন আবদুল আজিজ রহমাতুল্লাাহি আলাইহি হলেন সিরাত চর্চার অন্যতম একজন সফল রূপকার। সিরাত চর্চার সেই যে সূচনা হয়েছিলো তা অদ্যাবধি চলছে এবং চলবে অনাদিকাল পর্যন্ত। সিরাত চর্চার আলোকধারা বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো ইমাম বোখারি রহমাতুল্লাাহি আলাইহি, ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাাহি আলাইহি, ইমাম তিরমিজি রহমাতুল্লাাহি আলাইহি, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাাহি আলাইহি প্রমুখ মহান হাদিস সংকলকের অনবদ্য এবং বিশ্বস্ত গ্রন্থসমূহ সংকলনের মাধ্যমে।

সিরাত চর্চার ধারাবাহিকতাও অব্যাহত থাকবেঃ

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সিরাত চর্চা তার নবুওয়াতলাভের পর থেকেই অব্যাহত গতিতে চলে আসছে এবং চলতে থাকবে। আর নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা রক্ষার কারণে, তাঁর সম্পর্কে কোনো প্রকার ভুল ব্যাখ্যা কিংবা অপব্যাখ্যা উপস্থাপন অথবা, সত্যের সামান্য অপলাপ করার সুযোগ আদৌ কারও নেই। মুসলিম সিরাত চর্চাকারীগণ এ সুযোগ কাউকে দিবেন না, বরং প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সীরাত সম্পর্কে লাখো গ্রন্থ মুসলিম লেখকরা রচনা করেছেন এবং করছেন। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সীরাত বিষয়ক প্রতিটি গ্রন্থ অন্যান্য নবীর জীবনচরিত সংক্রান্ত গ্রন্থগুলোর তুলনায় অধিক স্বচ্ছ, নির্ভরযোগ্য ও ঐতিহাসিক। তার জীবনচরিতকে অগণিত মানুষ শুনছে ও পাঠ করছে। এর ধারাবাহিকতাও অব্যাহত গতিতে চলে আসছে এবং চলতেই থাকবে।

সিরাত চর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাঃ

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সিরাত চর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সর্বকালে সর্বযুগে এই জন্য রয়েছে যে, তিনি ছিলেন ইসলামের সর্বশেষ নবী। মানবজাতির কল্যাণের প্রতীক হয়ে আগমন করেন এই ধরণীতে। বিশ্ববাসীকে আহ্বান করেন কল্যাণের পথে, বিরত রাখেন সমূহ অকল্যাণ থেকে। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বিমূর্ত সত্তাকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। তার অনুসারীদের সরাসরি আল্লাহর অনুসরণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এসেছে,

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

যে ব্যক্তি রাসুলের আনুগত্য করলো, সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করলো। -সুরা নিসা: ৮০

অন্য আয়াতে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ ও তার রাসুলের অনুসরণ ও অনুকরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেই তা হবে কুফরি। কুফরের সঙ্গে জড়িত কাউকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন না। আল্লাহ তাআলার ঘোষণা-

قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

‘(হে রাসুল!) আপনি বলে দিন, আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য প্রকাশ কর। আর যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ কাফেরদের ভালোবাসেন না।’ -সুরা ইমরান : আয়াত ৩২

আয়াত নাজিলের কারণঃ

সুরা আল-ইমরানের ৩২ নং আয়াতটি শুধু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করেই ঘোষণা করা হয়নি বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকেও সম্বোধন করা হয়েছে।

কেননা আগের আয়াতেই আল্লাহ তাআলা মানবজাতির জন্য প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের বিষয়টি এভাবে তুলে ধরেছেন-

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

‘(হে রাসুল! আপনি) বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তবে আমার অনুসরণ কর; তাহলেই আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল দয়ালু।’ -সুরা আল-ইমরান : আয়াত ৩১

আয়াত দু'টিতে রয়েছে গভীর সামঞ্জস্য। বিশ্বনবির আনুসরণ ও আনুগত্যের মধ্যেই আল্লাহ তাআ'লার আনুগত্য শামিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের মাধ্যমেই মহান আল্লাহর আনুগত্য করা যায়। কেননা তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নিয়ে বিশ্ব মানবতার সামনে উপস্থিত হয়েছেন।

প্রিয় নবীজী ছিলেন আল কুরআনের অবিকল প্রতিবিম্বঃ

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন কুরআনের অবিকল প্রতিবিম্ব। পবিত্র কুরআনের বাস্তব ও সার্থক রূপায়ণ ছিলো তাঁর গোটা সিরাত বা জীবনচরিত। তাঁর ইন্তিকালের পর উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়শা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহাকে জিজ্ঞেস করা হলো, প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর চরিত্র কেমন ছিলো? তিনি একবাক্যে উত্তর দিয়েছিলেন, প্রিয় নবীজির চরিত্র ছিলো আল-কুরআন। অর্থাৎ, আল-কুরআনে যে ধরণের উত্তম আচার-আচরণের অধিকারী হতে আদেশ উপদেশ দেয়া হয়েছে এবং যে প্রকারের উন্নত ও প্রশংসনীয় স্বভাব-চরিত্র গঠন করতে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, সেসবের মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি। এর প্রমান পাওয়া যায় মহাগ্রন্থ আল কুরআনে। মহান রাব্বুল আলামিন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর অনুপম চরিত্র মাধুর্য ও সর্বোত্তম জীবনাদর্শের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

'আল্লাহর রাসুলের জীবনই হলো তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শের নমুনা।' -সুরা আহজাব: ২১

নবীজির বংশ পরিচিত, জন্ম ও শৈশব:

বংশ পরিচিতি:

হযরত মুহাম্মদ(স)-এর সম্মানিত পিতার নাম আব্দুল্লাহ।তিনি ক'বার মুতাওয়াল্লী আবদুল মুত্তালিবের পুত্র ছিলেন। তার বংশ-পরম্পরা উর্ধ্ব দিকে প্রায় ষাট পুরুষ পর্যন্ত পৌঁছে ইব্রাহীম (আঃ)-তনয় হযরত ইসমাঈল(আ)-এর সাথে মিলিত হয়েছে।তার খান্দানের নাম কুরাইশ।আরব দেশের অন্যান্য খান্দানের মধ্যে এটিই পুরুষানুক্রমে সবচেয় শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত খান্দান বলে পরিগণিত হয়ে আসছে। আরবদেশের ইতিহাসে এই খান্দানের অনেক বড়ো বড়ো মান্য-গণ্য ব্যক্তির নাম দেখতে পাওয়া যায়।এদের ভেতর আদনান, নাযার, ফাহার, কালাব, কুসসী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুসসী তার জামানায় কা'বা শরীফের মুতাওয়াল্লী ছিলেন ।তিনি অনেক বড়ো বড়ো স্মরণীয় কাজ করে গেছেন।যেমন : হাজীদের

পানি সরবরাহ করা, তাদের মেহমানদারির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। তার পরেও তার খান্দানের লোকেরা এই সকল কাজ আঞ্জাম দিতে থাকে।এসব জনহিতকর কাজ এবং কা'বা শরীফের মুতাওয়াল্লী হবার কারণে কুরাইশরা সারা আরব দেশে অতীব সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ খান্দান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।সাধারণভাবে আরবে লুটতরাজ, রাহাজানি ইত্যাকার দুষ্কৃতি হিসেবে স্বীকতি প্রচলিত ছিল এবং এ কারণে রাস্তাঘাট আদৌ নিরাপদ ছিল না।কিন্তু কা'বা শরীফের মর্যাদাও হাজীদের খেদমতের কারণে কুরাইশদের কাফেলার ওপর কখনো কেউ হামলা করতো না।তারা শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের ব্যবসায়ের পণ্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারতো।

আব্দুল মুত্তালিবের দশটি(মতান্তরে বারোটি) পুত্র ছিল।কিন্তু কুফর বা ইসলামের বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে পাঁচ জন মাত্র খ্যাতি লাভ করেন। প্রথম আব্দুল্লাহ, ইনি হযরত(স)-এর পিতা। দ্বিতীয়,আবু তালিব; ইনি ইসলাম কবুল করেননি বটে,তবে কিছুকাল হযরতের সাহায্য ও পৃষ্টপোষকতা করেছেন।তৃতীয়,হযরত হামযা(রা) এবং চতুর্থ,হযরত আব্বাস(রা)-এরা দুজনই ইসলামে সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেন এবংইসলামের ইতিহাসে অতীব উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন।আর পঞ্চম হচ্ছে আবু লাহাব;ইসলামের প্রতি বৈরিতার কারণে ইতিহাসে যার নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। কুরাইশদের একটি গোত্রের নাম হচ্ছে জাহারা। এই গোত্রের ওহাব বিন আবদুল মানাফের কন্যা আমিনার সঙ্গে আবদুল্লাহর বিবাহ হয়। সমগ্র কুরাইশ খান্দানের ভেতর ইনি একজন বিশিষ্ট মহিলা ছিলেন।বিবাহকালে আবদুল্লাহর বয়স ছিল মাত্র সতেরো বছর।বিয়ের পর খান্দানী রীতি অনুযায়ী তিনি তিন দিন শ্বশুরালয়ে অবস্থান করেন।অতঃপর ব্যবসায় উপলক্ষে সিরিয়া গমন করেন। ফিরবার পথে মদিনা পর্যন্ত পৌঁছেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। ঐ সময় আমিনা অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।

জন্ম ও শৈশবঃ

নীরবতার কোলে মাথা রেখে এক এক করে ঘুমিয়ে পড়েছে সকল মানুষ। লাগামহীন পাখি গুলোও নিরব-নিস্তব্ধ । শুধু জেগে আছে আরব প্রকৃতি,সেজে আছে আরব প্রকৃতি মাথার উপর ডানা মেলে থাকা আকাশ অদ্ভুত রূপ ধারণ করেছে । আকাশের সাথে চাঁদ মেতে উঠেছে গোপন সংলাপে । শত সহস্র মাইল দূরের তারাগুলো নিঃসঙ্গতার বিষাদ ভুলে আনন্দ উজ্জ্বল হয়ে ঝুঁকে পড়েছে পৃথিবীর দিকে। মোহনীয় এক সুখের সুর বাতাসে ভর করে দৌড়ে বেড়াচ্ছে প্রান্তর থেকে প্রান্তরে কি যেন একটা ঘটতে যাচ্ছে । কিসের আলামত যেন পৃথিবীর প্রাণে প্রাণে গান গেয়ে যাচ্ছে।

যে ফুল ফুটিল মক্কায়, সুবাসিত করিল সারা জাহান। আল্লাহর হাবিব তিনি মুহাম্মাদ (সাঃ)।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্তমান সৌদি আরবে অবস্থিত মক্কা নগরীর কুরাইশ গোত্রের বনি হাশিম বংশে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ৫৭০ খৃীস্টাব্দে ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। তার মায়ের নাম আমিনা এবং পিতার নাম আব্দুল্লাহ।
জন্ম নেয়ার পরেই আমেনা দাদা আব্দুল মুত্তালিবকে খবর পাঠান । আব্দুল মুত্তালিব খুশিতে তখনি শিশু মুহাম্মদ (সাঃ) কে কোলে নিয়ে তার নাম রাখেন মুহাম্মদ । কুরআনে নবী ঈসা (আ.)-এর ভাষায় বলা হয়েছে 'আহমাদ'। নবুয়তের পূর্বে তাকে ডাকা হতো 'আল-আমিন' বলে।

এক হাদিসে হজরত যুবায়ের ইবনে মুতইম (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি (সা.) বলেন, আমার পাঁচটি নাম রয়েছে, আমি 'মুহম্মাদ' ও 'আহমাদ' এবং আমি 'মাহী', যার আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফর মুছে দেন; এবং আমি 'হাশির', যেহেতু মানুষ পরকালে আমার ওপর নির্ভর করে সমবেত হবে; এবং আমি 'আকিব'। [বুখারী, হাদিস ৩৫৩২]

হজরত আবু মুসা আশআরি (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) আমাদের সামনে নিজের নাম এভাবে বলতেন, আমি মুহাম্মদ, আহমদ, মুকাফ্ফি, হাশির, নাবিউত তাউবা (তওবার নবী), নাবিউর রহমাহ (রহমতের নবী)।

দুগ্ধ পান কালঃ

সর্ব প্রথম তাঁকে তাঁর মাতা হযরত আমেনা দুগ্ধ পান করান। অতঃপর আবু লাহাবের বাঁদী 'সুওয়াইবা' তাকে দুগ্ধ পান করায়। অতঃপর ধাত্রীর সন্ধান করতে থাকেন। 'হাওয়াযিন' গোত্রের বানী সা'দ এর মহিলা হালীমা ছা'দিয়া এই বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী হন।

দুধপানকালে হালীমা নবী করীম (সাঃ) এর অলৌকিক ও বরকতময় অনেক দর্শ্য প্রত্যক্ষ করে । বিবি হালিমার বর্ননা সূত্রে ইতিহাসবিদ ইবনু ইসহাক্ব বলেন যে, বিবি হালীমাহ এবং তার স্বামী তার দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তান সহ বনু সা'দ গোত্রের এক দল মহিলার সঙ্গে অর্থের

বিনিময় দুধমান করাবে এমন শিশুর সন্ধানে মক্কা যান । বিবি হলীমাহ বলেন, আমি আমার একটি সাদা মাদী গাধার পিঠে সাওয়ার হয়ে চলছিলাম ।আমার সঙ্গে উটও ছিল । কিন্তু তার উলানেও দুধ ছিল না। আমার সঙ্গে শিশুটির জন্যও একবিন্দু দুধ ছিল না আমার বুকে । আর আমাদের সাথে গাধাটি ছিলো দূর্বল তাই আমাদের কাফেলার পিছনে পরে থাকতাম ।

তারপর আমাদের দলে এমন কনো মহিলা ছিল না যে যার কাছে শিশু মুহাম্মদ (সাঃ) কে দুধ পপান করানোর প্রস্তাব দেয়া হয়নি । কিন্তু সকলেই তাকে নিতে অস্বীকার করল । দলের সকল মহিলারা একটি করে শিশু সংগ্র করে নিল বিকি রইলাম শুধু আমি । পরবরতীতে আমি আমার স্বামীকে বললাম , সকলেই দুধপান করানোর জন্য শিশু নিয়ে ফিরছে আরি আমাকে শূন্য হাতে ফিরতে হচ্ছে । তার চেয়ে আমি সেই ইয়াতিম ছেলেকেই নিয়ে ফিরে যাই ।

শিশু মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে যখন তাবুতে ফিরে আসি তারপরে দুজন শিশুই দুগ্ধপানকরতে সক্ষম হন । এবং আমার স্বামী উট দোহন করাতে গিয়ে দেখেন তার ওলান দুধে পরিপূর্ন । বাড়ি ফেরার পথে আমাদের বাহন আর আগের মতন দূর্বল ছিল না । সকলে বলতে লাগলে এটিই কি তোমাদের পূরেবর বাহন ।
আমি বল্লাম হ্যা এটিই সেই বাহন যার সওয়ার হয়ে এসেছিলাম ।
আমাদের বকরীগুলো সবসময় উদর ভরে ঘাস খেয়ে আসতো । এবং আমরা সবাই পরিপূর্নভাবে দুধ দোহন করতাম ।

লালন-পাললনের দু-বছর পুরন হতেই শিশুটি বড় এবং সুঠাম দেহের অধিকারী হয়ে যায়।

বক্ষ বিদারন :

মা হালীমার নিকটে আসার পর জন্মের চতুর্থ কিংবা পঞ্চম বছরে শিশু মুহাম্মাদের সীনা চাক বা বক্ষ বিদারণের বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। ব্যাপারটি ছিল এই যে, মুহাম্মাদ তার সাথীদের সাথে খেলছিলেন। এমন সময় জিবরাঈল ফেরেশতা এসে তাকে কিছু দূরে নিয়ে বুক চিরে ফেলেন। অতঃপর কলীজা বের করে যমযমের পানি দিয়ে ধুয়ে কিছু জমাট রক্ত ফেলে দেন এবং বলেন, هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ‘এটি তোমার মধ্যেকার শয়তানের অংশ’। অতঃপর বুক পূর্বের ন্যায় জোড়া লাগিয়ে দিয়ে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। পুরা ব্যাপারটি খুব দ্রুত সম্পন্ন হয়।

সাথী বাচ্চারা ছুটে গিয়ে হালীমাকে খবর দিল যে, মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে। তিনি ছুটে এসে দেখেন যে, মুহাম্মাদ মলিন মুখে দাঁড়িয়ে আছে’।[1] হালীমা তাকে বুকে তুলে বাড়ীতে এনে সেবা-যত্ন করতে থাকেন। এই অলৌকিক ঘটনায় হালীমা ভীত হয়ে পড়েন। (তাঁর দ্বিতীয়বার বক্ষবিদারণ হয় মি‘রাজে গমনের পূর্বে মক্কায়।[2])
পরের দিন ভোর হতেই হালিমা মুহাম্মাদকে তাঁর মায়ের কাছে মক্কায় নিয়ে আসে। আমেনা অনির্ধারিত সময়ে হালিমাকে ছেলে নিয়ে আসতে দেখে আশ্চর্যান্বিত হন, অথচ তিনি ছেলেকে অন্তর থেকে দেখতে চাচ্ছিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে হালিমা বক্ষ বিদারণের ঘটনার পুরো বিবরণ দেন।

আমেনার মৃত্যু :

আমেনা নিজের এতিম শিশু মুহা্ম্মাদকে নিয়ে ইয়াসরাবে বনী নাজ্জার গোত্রে মামাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য যাত্রা করে। সেখনে কিছু দিন অবস্থান করে ফেরার পথে “আবওয়া” নামক স্থানে মৃত্যু বরণ করে এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। ফলে মুহাম্মাদ চার বছর বয়সে মাতৃ-স্নেহ ও আদরের ছায়া থেকে বঞ্চিত হন।

দাদা ও চাচার তত্ত্বাবধানেঃ

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) -এর মাতা-পিতার মৃত্যুর পর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর লালন পালনের দায়িত্ব নেন। তিনি তাকে খুব স্নেহ করতেন। এমনকি নিজের ছেলেদের উপরও তাঁকে প্রাধান্য দিতেন।তাকে নিজের আসনে বসাতেন। দাদা আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তই তিনি তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিলেন।
দাদা আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর চাচা আবু তালিব তাঁর দায়িত্ব নেন। তখন তার বয়স ছিল আট বছর। তিনি চাচা আবু তালিবকে বকরী লালন-পালন ও শাম দেশের ব্যবসার কাজে সহযোগিতা করতেন।

নিকাহ বা বিবাহঃ

মুহাম্মাদ ২৫ বছর বয়সে তার প্রথম স্ত্রী খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদের সাথে বিবাহ করেন। মহানবী মুহাম্মদ সা: তার ৬৩ বছর ৪ দিনের জীবনে মোট ১১টি বিবাহ করেন। রাসূল (সা.) এর ১১ জন স্ত্রীদের মধ্যে দশ জনই ছিলেন হয় বিধবা না হয় তালাক প্রাপ্তা। যথাক্রমে,

১.খাদিজা (রা:)।
২.সওদা বিনতে জামআ (রা:)।
৩.আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা:)।
৪.হাফসা বিনতে ওমর (রা:)।
৫.যয়নব বিনতে খোযায়মা (রা:)।
৬.উম্মে সালমা হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া (রা:)।
৭.যয়নব বিনতে জাহাশ ইবনে রিয়াব (রা:)।
৮.যুয়াইরিয়া বিনতে হারেস (রা:)।
৯.উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রা:)।
১০.সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রা:)।
১১.মায়মুনা বিনতে হারেস (রা:)।

নবুয়ত প্রাপ্তের পূর্ববতী জীবন:

জাহেলি যুগের লোকেরা যেসব কাজ করত, দুবারের বেশি কখনোই সেসব কাজ করার ইচ্ছা আমার হয়নি। সে দুটি কাজেও আল্লাহর পক্ষ থেকে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর সে ধরনের কাজের ইচ্ছা কখনো আমার জাগেনি।' তা হলো তিনি বকরি ও উট চরানোর সময় দুই দিন তিনি সঙ্গের বালকের কাছে পশু রেখে মক্কা নগরীতে হওয়া রাতের আড্ডায় অংশ নিতে আসেন। সেখানে গান-বাজনা হচ্ছিল। দুই দিনই আল্লাহ তাঁর কান বন্ধ করে দেন এবং তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।আরবদের মধ্যে বিদ্যমান হিংস্রতা, খেয়ানতপ্রবণতা এবং প্রতিশোধস্পৃহা দমনের জন্যই হিলফুল ফুজুল নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। মুহাম্মাদ এতে যোগদান করেন এবং এই সংঘকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে তিনি বিরাট ভূমিকা রাখেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় তরুণ বয়সে মুহাম্মাদের তেমন কোন পেশা ছিলনা। তবে তিনি বকরি চরাতেন বলে অনেকেই উল্লেখ করেছেন। সাধারণত তিনি যে বকরিগুলো চরাতেন সেগুলো ছিল বনি সা'দ গোত্রের। কয়েক কিরাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তিনি মক্কায় বসবাসরত

বিভিন্ন ব্যক্তির বকরিও চরাতেন। এরপর তিনি ব্যবসায় শুরু করেন। মুহাম্মাদ অল্প সময়ের মধ্যেই একাজে ব্যাপক সফলতা লাভ করেন। এতই খ্যাতি তিনি লাভ করেন যে তার উপাধি হয়ে যায় আল আমিন এবং আল সাদিক যেগুলোর বাংলা অর্থ হচ্ছে যথাক্রমে বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী। ব্যবসায় উপলক্ষ্যে তিনি সিরিয়া, বসরা, বাহরাইন এবং ইয়েমেনে বেশ কয়েকবার সফর করেন। মুহাম্মাদের সুখ্যাতি যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ তা অবহিত হয়েই তাকে নিজের ব্যবসার জন্য সফরে যাবার অনুরোধ জানান। মুহাম্মাদ এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং খাদীজার পণ্য নিয়ে সিরিয়ার অন্তর্গত বসরা পর্যন্ত যান।

খাদীজা মাইছারার মুখে মুহাম্মাদের সততা ও ন্যায়পরায়ণতার ভূয়সী প্রশংশা শুনে অভিভূত হন। এছাড়া ব্যবসায়ের সফলতা দেখে তিনি তার যোগ্যতা সম্বন্ধেও অবহিত হন। এক পর্যায়ে তিনি মুহাম্মাদকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় বান্ধবী নাফিসা বিনতে মুনব্বিহরের কাছে বিয়ের ব্যাপরে তার মনের কথা ব্যক্ত করেন। নাফিসার কাছে শুনে মুহাম্মাদ বলেন যে তিনি তার অভিভাবকদের সাথে কথা বলেন জানাবেন। মুহাম্মাদ তাঁর চাচাদের সাথে কথা বলে বিয়ের সম্মতি জ্ঞাপন করেন। বিয়ের সময় খাদীজার বয়স ছিল ৪০ আর মুহাম্মাদের বয়স ছিল ২৫।মুহাম্মাদের বয়স যখন ৩৫ বছর তখন কা'বা গৃহের পূনঃনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বেশ কয়েকটি কারণে কাবা গৃহের সংস্কার কাজ শুরু হয়। পুরনো ইমারত ভেঙে ফেলে নতুন করে তৈরি করা শুরু হয়। এভাবে পুনঃনির্মানের সময় যখন হাজরে আসওয়াদ (পবিত্র কালো পাথর) পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শেষ হয় তখনই বিপত্তি দেখা দেয়। মূলত কোন গোত্রের লোক এই কাজটি করবে তা নিয়েই ছিল কোন্দল। নির্মাণকাজ সব গোত্রের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু হাজরে আসওয়াদ স্থাপন ছিল একজনের কাজ। কে স্থাপন করবে এ নিয়ে বিবাদ শুরু হয় এবং চার-পাঁচ দিন যাবৎ এয বিবাদ অব্যাহত থাকার এক পর্যায়ে এটি এমনই মারাত্মক রূপ ধারণ করে যে হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় আবু উমাইয়া মাখজুমি একটি সমাধান নির্ধারণ করে যে পরদিন প্রত্যুষে মসজিদে হারামের দরজা দিয়ে যে প্রথম প্রবেশ করবে তার সিদ্ধান্তই সবাই মেনে নেবে। পরদিন মুহাম্মাদ সবার প্রথমে কাবায় প্রবেশ করেন। এতে সবাই বেশ সন্তুষ্ট হয় এবং তাকে বিচারক হিসেবে মেনে নেয়। আর তার প্রতি সবার সুগভীর আস্থাও ছিল। যা হোক এই দায়িত্ব পেয়ে মুহাম্মাদ অত্যন্ত সুচারুভাবে ফয়সালা করেন। তিনি একটি চাদর বিছিয়ে তার উপর নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদ রাখেন এবং বিবদমান প্রত্যেক গোত্রের নেতাদের ডেকে তাদেরকে চাদরের বিভিন্ন কোণা ধরে যথাস্থানে নিয়ে যেতে বলেন এবং তারা তা ই করে। এরপর তিনি পাথর উঠিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করেন।

নবুওয়াতী লাভ ও প্রথম কুরআন নাযিলঃ

রাসূল (সাঃ) চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়াতী লাভ করেন । তিনি মক্কা থেকে দুই মাইল দূরত্বে অবস্থিত (জাবালে নূর) হেরা গুহায় গিয়ে ধ্যানমগ্ন থাকতেন এবং এখানেই প্রথম কুরআনের আয়াত নাযিল হয় ।

জিবরিল (আঃ)- এর আগমনঃ

তিনি যখন হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন তখন আল্লাহর ফেরেস্তা জিবরাইল (আঃ) আগমন করেন ।

জিবরিল (আঃ) তার নিকট আগমন করে বললেন ‘তুমি পড়” । তিনি বললনে পড়ার অভ্যাস নেই আমার । তিনি আবারও বললেন ‘তুমি পড়” তিনি বললনে পড়ার অভ্যাস নেই আমার। তিনি তৃতীয় বার বুকে জরিয়ে নিলেন , তারপর নিনি আবারও বললেন ‘পড়’ তখন রাসূল (সাঃ) পড়তে শুরু করলেন :

জিব্রাইল তাঁকে এই পংক্তি কটি পড়তে বলেন:

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ◌
خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ ◌
ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ◌
ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ◌
عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ◌

অর্থঃ পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।

ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগঃ

নবুওয়াতের পরে তিন বছর গোপনে দাওয়াত কাজ করেন রাসূল (সাঃ) । তার প্রথম অবস্থাতে তিনি তার পরিবারে নিকট দাওয়াত প্রচার করেন ।

নবুওয়াতের প্রথম বছর:

তাঁর ওপর সূরায়ে আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (শরহুল মাওয়াহিব ১/২০৭) ঐতাহাসিকদের ঐক্যমত হলো নবুওয়াত দান করা হয়েছে রবিবার। কিন্তু মাসের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের ভিন্ন মত রয়েছে। ইবনে আব্দুল বার (রহ.)- এর মতে ৮ রবিউল আউয়াল তাঁকে নবুওয়াতের তাজ পরানো হয়। এই মতানুযায়ী নবুওয়াতপ্রাপ্তির সময় তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর। কিন্তু ইবনে ইসহাকের মত হলো তাঁকে ১৭ রমযান নবুওয়াত দানে ভূষিত করা হয়। এই মতানুযায়ী তখন তাঁর বয়স হয় চল্লিশ বছর ছয় মাস। হযরত ইবনে হাজার আসকলানী (রহ.) এই মতকেই প্রধান্য দিয়েছেন। (ফতহুল বারী ১২/৩১৩)।

নবুওয়াতের দ্বিতীয় বছর:

রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গোপনে তাবলীগে দ্বীনের কাজ শুরু করেন। এই বছরই হযরত খাদিজা ৯রাঃ), হযরত ওয়ারাকা ইবনে নাওফল (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ), হযরত আফীফ কিন্দী (রাঃ), হযরত তলহা (রাঃ), হযরত সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ), হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ), হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ), হযরত আম্মার (রাঃ), হযরত সুহাইব (রাঃ), হযরত আমর ইবনে আ'বাসা (রাঃ) এবং হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) ঈমান আনায়ন করেন। এ সকল মহান ব্যক্তিসহ আরো কয়েকজন সাহাবীকে সাবেকীনে আওয়ালীন তথা সর্ব প্রথম সাহাবী বলা হয়।

নবুওয়াতের তৃতীয় বছর:

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর লালিত সন্তান হযরত যায়েদ ইবনে হারেসার পুত্র হযরত উসামার জন্ম হয়।

নবুওয়াতের চতুর্থ বছর প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার:

মহান আল্লাহ তায়ালা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইসলামের দাওয়াতের আদেশ দিয়ে ইরশাদ করেন,

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ . (سورة المدثر)

হে চাদরাবৃত ব্যক্তি! ওঠ এবং সতর্ক কর

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর প্রতি প্রকাশ্য দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ আসে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রকাশ্য দাওয়াত দিতে আরম্ভ করলে আরব গোত্র বিশেষ করে কুরাইশরা প্রকাশ্য দুশমনী ও বৈরিতায় মেতে ওঠে।

নবুওয়াতের পঞ্চম বছর সাহাবাদের হাবশা হিজরত:

যার ইসলামের কথা ফাঁস হয়ে যেত তিনি মুশরিকদের নিপীড়নের সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতেন। বিশেষত দুর্বল মুসলিমরা। এ পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহাবীদেরকে দ্বীন নিয়ে হাবশায় (ইথিওপিয়া) হিজরত করার নির্দেশ দেন। তিনি সেখানকার শাসক নাজাসীর নিকট নিরাপত্তা পাওয়ার আশ্বাস দেন। অনেক মুসলমান নিজের জান ও পরিবার বর্গের ব্যাপারে নিরাপত্তাহীনতায় ভূগতো। তাই নবুওয়াতের ৫ম বছরে প্রায় ৭০ জন মুসলিম সপরিবারে হিজরত করেন। তাঁদের মধ্যে উসমান বিন আফফান ও তাঁর স্ত্রী রুকাইয়্যাও ছিলেন। এ দিকে কুরাইশরা ইথিওপিয়ায় হিজরত কারীদের অবস্থান ব্যাহত করার চেষ্টা করে। সে দেশের রাজার জন্য পাঠায় উৎকোচ। পলায়নকারীদের (মুহাজির) বহিস্কারের অনুরোধ জানায়। তারা আরো বলে যে, মুসলিমরা ঈসা আলাইহিস সালাম ও মরিয়াম সম্পর্কে অপমানকর ও অশিষ্ট বাক্য ব্যবহার করে। নাজাসী তাদেরকে ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা সত্যটি সুস্পষ্ট ভাবে বলে দেন, শাসক মুসলিমদের আশ্রয় দেন এবং বহিস্কার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। এ বছরের রমযান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম শরীফে যান। সেখানে ছিল কুরাইশেরএক দল লোক। তিনি দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে তাদের সামনে সুরায়ে নাজম তেলাওয়াত করতে লাগলেন। এ সব কাফেররা ইতিপূর্বে কখনো আল্লাহর বাণী শুনেনি। কেননা তাঁরা রাসূলের কিছুই না শুনার পদ্ধতি অনুসরণ করে আসতেছিলো। আকস্মাৎ তেলাওয়াতের মধুর ধ্বনি তাদের কর্ণে গেলে তাঁরা আল্লাহর

হৃদয়গ্রাহী চিত্তাকর্ষক বাণী ও সাবলীল ভাষা একাগ্রচিত্তে শুনে। অন্তরে তা ছাড়া অন্য কিছুই নেই। এক পর্যায়ে রাসূল— ﴿ فَٱسۡجُدُواْۤ لِلَّهِۤ وَٱعۡبُدُواْ۩ ٦٢ ﴾ [النجم:62] আয়াতটি পড়ে সেজদায় চলে যান। উপস্থিত ব্যাক্তিদের মধ্যে কেউ নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রন করতে পারেনি। তাঁরাও সেজদায় চলে যায়। অনুপস্থিত মুশরিকরা তাদেরকে তিরস্কার করে, ভৎসনা করে। অন্য কোন উপায় না দেখে এরা রাসূলের বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করে যে, তিনি তাদের মূর্তির প্রশংসা করেন এবং বলেন, “তাদের (মুর্তিসমূহের) সুপারিশের আশা করা যায়” সেজদা করার অজুহাত স্বরুপ এ ভিত্তিহীন, নিরেট মিথ্যার বেসাতী করে তারা।

হযরত জাফর ইবনে আবী তালেব (রাঃ) ইসলাম গ্রহন করেন। এই বছরই হাবশার প্রতি প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরত অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম হিজরতে ১১ জন পুরুষ এবং ৫ জন নারী অংশগ্রহন করেন। (ফতহুল বারী ১/১৮০) দ্বিতীয় হিজরতে ৮৬ জন পুরুষ এবং ১৬ জন নারী অংশগ্রহন করেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম ১/১১১) এই বছরই আবু জেহেলের হাতে হযরত সুমায়্যা (রাঃ) শহীদ হন। ইসলামের জন্য নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম শহীদ।

নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছর হযরত ওমর (রা:) ইসলাম গ্রহণ:

ইসলাম গ্রহণের আগে হযরত উমর (রাঃ) ছিলেন ইসলামের কঠোরতম দুশমনদের অন্যতম। কুরাইশরা একদিকে ইসলামী আন্দোলন ও তাঁর আহবায়কের বিরোধিতায় চরমপন্থা অবলম্বন করতে লাগলো, অন্যদিকে এদের সঠিক পথ নির্দেশনার জন্যে হযরত (স)-এর হৃদয়-মন প্রেমের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। আবু জেহেল এবং উমর উভয়েই তাঁর দুশমনীতে অত্যন্ত কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো। দাওয়াত ও তাবলীগের কোনো প্রচেষ্টাই তাদের উপর কার্যকর হচ্ছিল না। তাই একদিন রাহমাতুল্লিল আলামীন সরাসরি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন : ‘প্রভূ হে! আবু জেহেল এবং উমর এ দু’জনের মধ্যে যে তোমার কাছে বেশি প্রিয়, তাকে তুমি ইসলামের দ্বারা সম্মানিত করো। এ দোয়ার কয়েকদিন পরই হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করার তওফীক লাভ করেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, ‘একদা রাত্রে আমি হযরত (স)-কে উত্যক্ত করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলাম। তখন তিনি কাবার মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি ত্রস্তপায়ে এগিয়ে গিয়ে নামাজ শুরু করলেন। আমি তা শুনবার জন্যে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি সূরা আল-হাক্কাহ থেকে কিরআত পড়ছিলেন। আমি সে কালাম শুনে বিস্ময়ে মুগ্ধ হলাম। তার কবিত্বময় ভাষা

ও বর্ণনাভঙ্গি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী মনে হলো। আমি মনে মনে ভাবলাম : খোদার কসম! লোকটি নিশ্চয়ই কবি। ঠিক এ মুহুর্তেই তিনি এ আয়াত পড়লেন :

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ{40} وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ{41}

অর্থ : এ এক সম্মানিত বার্তাবাহকের কালাম, এ কোনো কবির বাণী নয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে খুব কম লোকই ঈমান এনে থাকে। (আয়াতঃ ৪০-৪১)

একথা শোনামাত্রই আমার ধারণা : 'ওহো, লোকটি তো আমার মনের কথা জেনে ফেলেছে। এ নিশ্চয়ই কোনো গণক হবে।' এরপরই মুহাম্মদ (স)-এ আয়াত পাঠ করলেন :

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ{42} تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ{43}

অর্থঃ এ কোনো গণকের কালাম নয়; তোমরা খুব কমই নসিহত পেয়ে থাকো। এতো রাব্বুল 'আলামীনের কাছ থেকে নাযিল হয়েছে। (আয়াতঃ ৪২-৪৩)

তিনি এ সূরা শেষ পর্যন্ত পড়লেন। আমি অনুভব করলাম, ইসলাম আমার হৃদয়ে তার আসন করে নিচ্ছে।'

কিন্তু যতদূর মনে হয়, হযরত উমর (রাঃ) অত্যন্ত শক্ত প্রকৃতির ও দৃঢ় চিত্ত লোক ছিলেন। এজন্যে এবারই তাঁর ভেতরকার পরিবর্তনটা পূর্ণ হলো না। তিনি তাঁর চিরাচরিত পথেই চলতে লাগলেন। এমনকি, একদিন তিনি দুশমনীর তাড়নায় উত্তেজিত হয়ে হযরত (স)-কে হত্যা (নাঊযুবিল্লাহ) করার উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে ঘর থেকে বেরুলেন। পথিমধ্যে নয়ীম বিন আব্দুল্লাহর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো। সে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাচ্ছ ওমর?' তিনি বললেন, 'মুহাম্মদ (স)-কে হত্যা করতে যাচ্ছি।' নয়ীম বললো, 'আগে তোমার নিজের ঘরেরই খবর নিয়ে দেখো। তোমার নিজের বোন-ভগ্নিপতিই তো ইসলাম গ্রহণ করেছে।'

একথা শুনে ওমর মোড় ফিরলেন এবং সোজা বোনের বাড়ীতে গিয়ে হাযির হলেন। তাঁর বোন-ভগ্নিপতি উভয়েই তখন কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। ওমরকে আসতে দেখেই তাঁরা চুপ করে গেলেন এবং কুরআনের অংশটি লুকিয়ে ফেললেন। কিন্তু তারা যে কিছু পড়ছেন,

তা ওমর টের পেয়েছিলেনল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী পড়ছিলে? তোমরা নাকি বাপ-দাদার ধর্মকে ত্যাগ করেছ? একথা বলেই তিনি ভগ্নিপতিকে প্রহার করতে লাগলেন। স্বামীর সাহায্যের জন্যে বোন এগিয়ে এলে তাঁকেও তিনি মারতে লাগলেন। এমনকি উভয়ে রক্তাপ্লুত হয়ে গেলেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তারা সুস্পষ্ট ভাষায় বললেন, : ‘আমরা সজ্ঞানে ইসলাম কবুল করেছি; সুতরাং তোমার কোনো কঠোরতাই আমাদেরকে এ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।’ তাদের এই অটল সংকল্প দেখে হযরত ওমর (রাঃ) কিছুটা প্রভাবিত হলেন। তিনি বললেন,‘ আচ্ছা তোমরা কি পড়ছিলে আমাকে শোনাও দেখি।’

বোন ফাতিমা কুরআনের অংশটি এনে সামনে রাখলেন। সেটি ছিলো সূরা তা-হা। তিনি পড়তে শুরু করলেন এবং এই আয়াত পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন :

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي{14}

‘আমিই খোদা, আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই; সুতরাং আমারই বন্দেগি করো এবং আমায় স্মরণের জন্যে নামায পড়ো।’

এ পর্যন্ত আসতেই তিনি এতটা প্রভাবিত হলেন যে, হঠাৎ সজোরে বলে উঠলেন : লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ। এরপর তিনি সেখান থেকে সোজা হযরত (স)-এর খেদমতে রওয়ানা হলেন। এ সময় হযরত (স) সাহাবী আরকামের গৃহে অবস্থান করছিলেন। ওমর দরজার কাছে পৌঁছলে তাঁর হাতে তরবারি দেখে উপস্থিত সাহাবীগণ ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু হযরত হামযা (রাঃ) বললেন, ‘আসুক না, তার নিয়্যত যদি ভাল হয় তো ভাল কথা। নচেৎ তার তরবারি দ্বরাই তার মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলবো।’ ওমর ঘরের মধ্যে পা বাড়াতেই হযরত (স) এগিয়ে এসে তাকে সজোরে আকঁড়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন :‘কি ওমর, কি উদ্দেশ্যে এসেছ?’ একথা শুনেই যেন ওমর ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি অত্যন- বিনয়ের সাথে জবাব দিলেন, ‘ঈমান আনার উদ্দেশ্যে।’ হযরত (স) স্বতস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন, ‘আল্লাহু আকবার’ সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সাহাবী তকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করলেন।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামী সংগঠনের শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেলো। এতদিন মুসলমানরা প্রকাশ্যে ধর্মীয় কর্তব্য পালন করতে পারছিল না; কাবা গৃহে জামাআতের সাথে নামায পড়াও ছিলো অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম

গ্রহণের পর অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটলো। তিনি নিজেই প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন। এ ব্যাপারে অনেক হাঙ্গামা হলো বটে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা কা'বা মসজিদে জা'মায়াতের সাথে নামায আদায় করার সুযোগ লাভ করলো; তাদের সংগঠনও আগের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হলো। পরন্ত আল্লাহর দরবারে আখিরী নবী (স)-এর দো'আ কতোখানি মঞ্জুর হয়েছিল, তাও বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করতে পারলো। দীর্ঘ চৌদ্দশ বছর অতিক্রান্ত হবার পরও আজ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ওমর (রাঃ)-এর দ্বারা ইসলামকে যে সম্মান ও মর্যাদা দান করেন, তার দ্বিতীয় কোনো নজীর নেই।

ওমরের রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ মুসলমানদের জন্য বড় বিজয় ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ফারুক বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে সত্য ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করেছেন। ইসলাম গ্রহনের কয়েক দিন পরে ওমার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি সত্যের উপরে নই? তদুত্তোরে তিনি বললেন কেন নয়, নিশ্চয় আমরা সত্যের মধ্যে। ওমর বললেন তাহলে এত গোপনীয়তা কি জন্যে। তখন আরকামের বাড়ীতে সমাবেত মুসলিমদেরকে নিয়ে বের হয়ে পড়েন এবং তাদেরকে দুদলে বিভক্ত করে দেন। হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে একদল এবং ওমার বিন খাত্তাবের নেতৃত্বে আর একদলের নব সঞ্চারিত শক্তির ঈঙ্গিত দেয়ার জন্যে মক্কার বিভিন্ন অলি-গলি প্রদক্ষিণ করে। কুরাইশরা দাওয়াত দমন করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে। শাস্তি, নির্যাতন, নিপীড়ন, প্রলোভন ও হুমকি প্রদর্শনের মতো সর্ব প্রকার পন্থা গ্রহণ করে। কিন্তু এসব কুপরিকল্পিত ব্যবস্থাসমূহ মুসলমানদের ঈমান বৃদ্ধি ও দ্বীন ইসলামকে অধিকতর আঁকড়ে ধরা ছাড়া আর কোন ভুমিকা রাখতে পারেনি। এক নতুন দুরভিসন্ধি ও মন্দ অভিপ্রায় তাদের অন্তরে জন্ম নিল। আর তা হচ্ছে মুসলমান ও বনী হাশেমকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন ও একঘরে করে রাখার এক চুক্তিনামা লিখে, যাতে সবাই সাক্ষর করবে, কাবা শরিফের অভ্যন্তরে ঝুলিয়ে দেবে। চুক্তি অনুসারে তাদের সাথে বেচা- কেনা, বিয়ে শাদি, সাহায্য সহযোগিতা, ও লেন-দেন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে। এ চুক্তির ফলে মুসলিমরা বাধ্য হয়ে মক্কা থেকে বের হয়ে (শো'বে আবি তালেব নামক) এক উপত্যাকায় গিয়ে আশ্রয় নেন। তাঁরা অবর্ণনীয় ক্লেশ ও দুঃখের শিকার হন সেখানে। ক্ষুধা ও অর্ধাহারের বিষাক্ত ছবোল থেকে কেউ রক্ষা পায়নি। স্বচ্ছল ও সামর্থবান ব্যক্তিরা নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করে ফেলেন। খাদীজা তাঁর সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করেন। বিভিন্ন রোগ ছাড়িয়ে পড়লো। অধিকাংশ লোকই মৃত্যুর প্রায়-দ্বার প্রান্তে এসে দাড়ালেন। কিন্ত তাঁরা ধৈর্য অবিচলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তাঁদের মধ্যে একজনও পশ্চাদপদ হননি।

অবরোধ একাধারে তিন বছর স্থায়ী রইল। অতঃপর বনী হাশেমের সাথে আত্মীয়তা আছে এমন কিছু শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি জনসমাবেশে চুক্তি ভঙ্গ করার কথা ঘোষনা করে। চুক্তির কাগজ বের করা হলে দেখা যায় যে সেটা খেয়ে ফেলা হয়েছে। শুধুমাত্র কাগজের এক কোণ যেখানে "বিসমিকা আল্লাহুম্মা" লেখাছিল সেটাই অক্ষত রয়েছে। সংকটের অবসান হল। আর মুসলিম ও বনী হাশেম মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু কুরাইশরা মুসলিমদের দমন ও মুকাবিলায় সেই রকম রুঢ়তা ও কঠোরতা ক্ষনিকের তরেও পরিহার করেনি।

নবুওয়াতের সপ্তম বছর বয়কট অবরুদ্ধ জীবন:

মুকাত'আয়ে কুরাইশের তথা স্যোসাল বয়কটের ঘটনা ঘটে। রাসূল (সাঃ)- এর সাথে বনু হাশেম এবংব নু মুত্তালিবকে শু'আবে আবী তালেবে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। এ অবস্থাতেই রাসূল (সাঃ)-এর চাচাত ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- এর জন্ম হয়। (রওজুল আনফ ১/২৩২)

নবুওয়াতের অষ্টম বছর চন্দ্র দ্বিখন্ডীত করন:

সবকিছুতে ব্যর্থ হয়ে সবশেষে ইহূদী পন্ডিতেরা কুরায়েশ নেতাদের একটা বিস্ময়কর কৌশল শিখিয়ে দিল। তারা বলল, মুহাম্মাদ জাদুকর কি-না, যাচাইয়ের একটা প্রকৃষ্ট পন্থা এই যে, জাদুর প্রভাব কেবল যমীনেই সীমাবদ্ধ থাকে। আসমানে এর কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। অতএব তোমরা মুহাম্মাদকে বল, সে চাঁদকে দ্বিখন্ডিত করুক। সম্ভবতঃ হযরত মূসা (আঃ) কর্তৃক লাঠির সাহায্যে নদী বিভক্ত হওয়ার মু'জেযা থেকেই চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করার চিন্তাটি ইহূদীদের মাথায় এসে থাকবে। অথচ নদী বিভক্ত করার চাইতে চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করা কতই না কঠিন বিষয়। কেননা এটি দুনিয়ার এবং অন্যটি আকাশের। কুরায়েশ নেতারা মহা খুশীতে বাগবাগ হয়ে গেল এই ভেবে যে, এবার নির্ঘাত মুহাম্মাদ কুপোকাৎ হবে। তারা দল বেঁধে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে এক চন্দ্রোজ্জ্বল রাত্রিতে উক্ত প্রশ্ন করল। ঐ সময় সেখানে হযরত আলী, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, জুবায়ের ইবনু মুত্ব'ইম প্রমুখ ছাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু ছাহাবী উক্ত বিষয়ে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যে কারণে হাফেয ইবনু কাছীর এতদসংক্রান্ত হাদীছসমূহকে 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ভুক্ত বলেছেন *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ক্বামার)*।

কুরায়েশ নেতাদের দাবী মোতাবেক আল্লাহর হুকুমে রাসূল (ছাঃ)-এর উক্ত মু'জেযা প্রদর্শিত হ'ল। মুহূর্তের মধ্যে চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়ে পূর্ব ও পশ্চিমে ছিটকে পড়ল। উভয় টুকরার মাঝখানে

‘হেরা’ পর্বত আড়াল হয়ে গেল। অতঃপর পুনরায় দুই টুকরা এসে যুক্ত হ’ল। এ সময় আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) মিনা-তে ছিলেন। ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) কর্তৃক ছহীহায়নের বর্ণনায় এসেছে যে, এরপর রাসূল (ছাঃ) উপস্থিত নেতাদের বললেন, اِشْهَدُوْا ‘তোমরা সাক্ষী থাক’।[1] ইবনু মাস‘ঊদ ও ইবনু ওমর (রাঃ) কর্তৃক ছহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে যে, ঐসময় আল্লাহকে সাক্ষী রেখে রাসূল (ছাঃ) বলেন,اَللَّهُمَّ اشْهَدْ ‘হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক’।[2] এতে অনুমিত হয় যে, ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর সাথে ঐ সময় ইবনু ওমর (রাঃ) হাযির ছিলেন এবং উভয়ে উক্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ১৩ বছরের মত। ঘটনাটি ৯ম নববী বর্ষে ঘটে।[3] উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা ক্বামার নাযিল হয়। যার শুরু হ’ল اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ‘ক্বিয়ামত আসন্ন। চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে’ *(ক্বামার ৫৪/১)*। এত বড় ঘটনা চাক্ষুষ দেখা সত্ত্বেও কুরায়েশ নেতারা ঈমান আনলেন না। পরে বিভিন্ন এলাকা হ’তে আগত লোকদের কাছেও তারা একই ঘটনা শোনেন। ইবনু মাসঊদ বলেন, তারা বললেন, এটা আবু কাবশার পুত্রের (মুহাম্মাদের) জাদু। সে তোমাদের জাদু করেছে। অতএব তোমরা বহিরাগত লোকদের জিজ্ঞেস কর। কেননা মুহাম্মাদ একসঙ্গে সবাইকে জাদু করতে পারবে না। অতএব বহিরাগতরা বললে সেটাই ঠিক। নইলে এটা স্রেফ জাদু মাত্র। অতঃপর চারদিক থেকে আসা মুসাফিরদের জিজ্ঞেস করলেন। তারা সবাই এ দৃশ্য দেখেছেন বলে সাক্ষ্য দেন’।[4] কিন্তু যিদ ও অহংকার তাদেরকে ঈমান আনা হ’তে বিরত রাখলো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَإِن يَّرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ، وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ‘তারা যদি কোন নিদর্শন (যেমন চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করণ) দেখে, তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে যে, এটা তো চলমান জাদু’। ‘তারা মিথ্যারোপ করে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। অথচ প্রত্যেক কাজের ফলাফল (ক্বিয়ামতের দিন) স্থিরীকৃত হবে *(ক্বামার ৫৪/২-৩)*।

তারীখে ফিরিশতায় বর্ণিত হয়েছে যে, চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার এই দৃশ্য ভারতের মালাবারের জনৈক মহারাজা স্বচক্ষে দেখেন এবং তা নিজের রোজনামচায় লিপিবদ্ধ করেন। পরে আরব বণিকদের মুখে ঘটনা শুনে তখনকার রাজা ‘সামেরী’ উক্ত রোজনামচা বের করেন। অতঃপর তাতে ঘটনার সত্যতা দেখে তিনি মুসলমান হয়ে যান। যদিও সামরিক নেতা ও সমাজনেতাদের ভয়ে তিনি ইসলাম গোপন রাখেন’।[5] ১৯৬৯ সালের ২০শে জুলাই চন্দ্রে প্রথম পদাপর্ণকারী দলের নেতা নেইল আর্মষ্ট্রং স্বচক্ষে চন্দ্রপৃষ্ঠের বিভক্তি রেখা দেখে বিস্ময়াভিভূত হন এবং ইসলাম কবুল করেন। কিন্তু মার্কিন প্রশাসনের ভয়ে তিনি একথা কয়েক বছর পরে প্রকাশ করেন।[6]

চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করা ছাড়াও রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মু‘জেযা প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু এগুলি ছিল কেবল হঠকারীদের অহংকার চূর্ণ করার জন্য। এর দ্বারা তারা কখনোই হেদায়াত লাভ করেনি। যদিও এর ফলে দ্বীনদারগণের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে

নবুওয়াতের দশম বছর বয়কট হতে মুক্তি:

মুকাতাআ সমাপ্ত হয়। (তবকাতে ইবনে সাআদ ১/১৩৯) এ বছরই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর চাচা আবু তালেব ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের প্রায় ৩ থেকে ৫ দিন পর হযরত খাদিজা (রাঃ)- এর ইন্তেকাল হয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই বছরকে আম্মুল হুজন তথা পেরেশানির বছর হিসেবে আখ্যায়িত করেন। (শরহুল মাওয়াহেব ১/২৯১) এ বছরই হযরত সাওদা বিনতে যুমআর সাথে রাসূল (সাঃ)- এর শাদি মোবারক অনুষ্ঠিত হয়। এই বছর হযরত আয়েশা (রাঃ) ও তাঁর আকদে নেকাহ আসেন। কিন্তু রুখসতী হয়নি। এই বছর তায়েফের হৃদয়বিদারক ঘটনাও ঘটে। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া)।

নবুওয়াতের একাদশ বছর মদিনায় ইসলাম:

মদীনা থেকে আগত হাজীদের মধ্যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর দাওয়াতে প্রায় ৬ জন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহন করেন। এর মাধ্যমে আনসারদের ইসলাম দীক্ষিত হওয়ার ধারা আরম্ভ হয়। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/১৪৮)

নবুওয়াতের দ্বাদশ বছর মেরাজ:

তায়েফ থেকে ফিরে আসা, তাদের রুঢ় ও অমানবিক আচরণ এবং আবু তালিব ও খাদিজার মৃত্যুর পর কুরাইশের অত্যাচার বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে একাধিক চিন্তা একত্রিত হয়। মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে শোকাহত ও দুঃখে কাতর নবীর সান্তনা আসে। নবুওয়াতের ১০ম সালে রজবের ২৭ তারিখের রাতে তিনি যখন নিদ্রারত ছিলেন, জিবরাঈল বুরাক নিয়ে আসেন। বোরাক ঘোড়া সদৃশ এক

জন্তু যার দু'টি দ্রুতমান পাখা আছে বিদ্যুতের ন্যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তাতে আরোহণ করানো হয় এবং জিবরাঈল তাকে ফিলিস্তীনে বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রথমে নিয়ে যান। অতঃপর সেখান থেকে আসামান পর্যন্ত নিয়ে যান। এ ভ্রমনে তিনি পালনকর্তার বড় বড় নিদর্শন পরিদর্শন করেন। আসমানেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করা হয়। তিনি একই রাত্রে তুষ্ট মন ও সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে মক্কায় প্রত্যাগমন করেন। ভোর বেলায় কাবা শরিফে গিয়ে তিনি লোকদেরকে একথা শুনালে কাফেরদের মিথ্যার অভিযোগ ও ঠাট্রা বিদ্রুপ আরোপ বেড়ে যায়। উপস্থিত কয়েক জন লোক তাঁকে বাইতুল মুকাদ্দাসের বিবরণ দিতে বলে। মূলত উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে অপারগ ও অক্ষম প্রমাণিত করা। তিনি তন্ন তন্ন করে সব কিছু বলতে লাগলেন। কাফেররা এতে ক্ষান্ত না হয়ে বলে, আমরা আর একটি প্রমাণ চাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি পথে মক্কাগামী একটি কাফেলার সাক্ষাৎ পাই এবং তিনি কাফেলার বিস্তারিত বিবরণসহ উটের সংখ্যা ও আগমনের সময়ও বলে দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যই বলেছেন কিন্তু কাফেররা হটকারিতা, কুফর ও সত্যকে অস্বীকার করার দরুণ ভ্রান্ত রয়ে গেল। সকাল বেলায় জিবরাঈল এসে রাসূলকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পদ্ধতি ও সময়সুচী শিখিয়ে দিলেন। ইতিপূর্বে নামায শুধু সকাল বেলায় দু'রাকআত ও বিকেল বলায় দু'রাকআত ছিলো। কুরাইশরা সত্য অস্বীকার করতে থাকায় এ দিনগুলোতে তিনি মক্কায় আগমণকারী ব্যক্তিদের মাঝে দাওয়াতী তৎপরতা চালাতে লাগলেন। তিনি তাদের অবস্থান স্থলে মিলিত হয়ে দাওয়াত পেশ করতেন এবং তাঁর সুন্দর ব্যাখ্যা দিতেন। আবু লাহাব তাঁর পিছনে তো লেগেই থাকতো। সে লোকদেরকে তাঁর থেকে ও তাঁর দাওয়াত থেকে সতর্ক থাকতে বলতো। এক বার ইয়াসরিব থেকে আগত এক দলকে ইসলামের আহবান জানালে তাঁরা মনোযোগ দিয়ে শুনে এবং তাঁর অনুসরণ ও তাঁর প্রতি ঈমান আনতে ঐক্যবদ্ধ হয়। ইয়াসরিববাসী ইয়াহূদীদের কাছে শুনতো যে অদূর ভবিষ্যতে একনবী প্রেরিত হবেন। তাঁর আবির্ভাবের যুগ নিকটে এসে গেছে। তাদেরকে যখন তিনি ইসলামের দাওয়াত দেন, তাঁরা বুঝতে পারলো যে তিনি সেই নবী যার কথা ইয়াহূদীরা বলেছে। তাঁরা সত্ত্বর ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে এবং বলে ইয়াহূদীরা যেন আমাদের অগ্রগামী না হয়। তাঁরা ছিল ৬ জন, পরবর্তী বছর ১২ জন আসে। তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৌলিক শিক্ষা দেন। প্রত্যাবর্তনের সময় তাদের সাথে তিনি মুসআব বিন উমাইরকে কুরআন ও দ্বীনের বিধানাবলী শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠান। মুসআব মদিনায় বিরাট প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। এক বছর পর তিনি যখন মদিনায় আসেন, তখন তাঁর সাথে ৭২ জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে মিলিত হন এবং তাঁরা দ্বীনের সহযোগিতা ও এর প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। অতঃপর তাঁরা মদিনায় ফিরে যান।

রাসূল (সাঃ)- এর ঐতিহাসিক মে'রাজ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উম্মতের ওপর ৫ ওয়াক্ত নামায ফরজ হয়। এ বছরই বাইআতে উকবায়ে উলা সংঘঠিত হয়। এতে ১২ জন ইসলাম গ্রহন করেন। (শরহুল মুওয়াহেব ১/৩১৬)।

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছর মদিনায় হিজরত:

বাইআতে উকবায়ে ছানিয়া অনুষ্ঠিত হয়। যাতে ৭৩ জন পুরুষ এবং ২ জন নারী ইসলাম গ্রহন করেন। এ বছরই মুসলমানরা মদীনা হিজরতের অনুমতি পান। এ বছরই কুরাইশরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- কে হত্যার সিন্ধান্ত নেয়। হযরত জিবরাঈল (আঃ) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- কে কুরাইশদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত করে বলেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এখান থেকে হিজরতের অনুমতি প্রদান করেছেন। অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত আবু বকর (রাঃ)- কে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় হিজরত করেন।

রাসূল (সাঃ)- এর মাদানী জিন্দেগী:

হিজরতের পরের সময়কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর মাদানী যিন্দেগী বলা হয়। যা ছিল অত্যন্ত গৌরবদীপ্ত সময়। এ সময়গুলোতে রাসূল (সাঃ)- এর অক্লান্ত মেহনত, চেষ্টা কুশেশ এবং আত্নউৎসর্গের মাধ্যমে ইসলামের বিজয়কেতন হস্তগত হয়।

মদীনায় হিজরতঃ

এরপর আরও শুভ ঘটনা ঘটে। মদীনার বেশকিছু লোক ইসলামের প্রতি উৎসাহী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। তারা মূলত হজ্জ্ব করতে এসে ইসলামে দাওয়াত পেয়েছিল। এরা আকাব নামক স্থানে মুহাম্মাদের কাছে শপথ করে যে তারা যে কোন অবস্থায় নবীকে রক্ষা করবে এবং ইসলামে প্রসারে কাজ করবে। এই শপথগুলো আকাবার শপথ নামে সুপরিচিত। এই

শপথগুলোর মাধ্যমেই মদীনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং একসময় মদীনার ১২ টি গোত্রের নেতারা একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের মাধ্যমে মুহাম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় আসার আমন্ত্রণ জানায়। মদীনা তথা ইয়াসরিবে অনেক আগে থেকে প্রায় ৬২০ সাল পর্যন্ত গোত্র গোত্র এবং ইহুদীদের সাথে অন্যদের যুদ্ধ লেগে থাকে। বিশেষত বুয়াছের যুদ্ধে সবগুলো গোত্র যুদ্ধে অংশ নেয়ায় প্রচুর রক্তপাত ঘটে। এ থেকে মদীনার লোকেরা বুঝতে সমর্থ হয়েছিল যে, রক্তের বিনিময়ে রক্ত নেয়ার নীতিটি এখন আর প্রযোজ্য হতে পারেনা। এজন্য তাদের একজন নেতা দরকার যে সবাইকে একতাবদ্ধ করতে পারবে। এ চিন্তা থেকেই তারা মুহাম্মাদকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, যদিও আমন্ত্রণকারী অনেকেই তখনও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। এই আমন্ত্রণে মুসলিমরা মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে যায়। সবশেষে মুহাম্মাদ ও আবু বকর ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদীনায় হিজরত করেন। তাদের হিজরতের দিনেই কুরাইশরা মুহাম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)হত্যার পরিকল্পনা করেছিল যদিও তা সফল হয়নি। এভাবেই মক্কী যুগের সমাপ্তি ঘটে।

মাদানী জীবনঃ

নিজ গোত্র ছেড়ে অন্য গোত্রের সাথে যোগদান আরবে অসম্ভব হিসেবে পরিগণিত হত। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে সেরকম নয়, কারণ এক্ষেত্রে ইসলামের বন্ধনই শ্রেষ্ঠ বন্ধন হিসেবে মুসলিমদের কাছে পরিগণিত হত। এটি তখনকার যুগে একটি বৈপ্লবিক চিন্তার জন্ম দেয়। ইসলামী পঞ্জিকায় হিজরতের বর্ষ থেকে দিন গণনা শুরু হয়। এজন্য ইসলামী পঞ্জিকার বর্ষের শেষে AH উল্লেখিত থাকে যার অর্থ: After Hijra।

স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও সংবিধান প্রণয়ন:

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় গিয়েছিলেন একজন মধ্যস্থতাকারী এবং শাসক হিসেবে। তখন বিবদমান দুটি মূল পক্ষ ছিল আওস ও খাযরাজ। তিনি তার দায়িত্ব সুচারুরুপে পালন করেছিলেন। মদীনার সকল গোত্রকে নিয়ে ঐতিহাসিক মদীনা সনদ স্বাক্ষর করেন যা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম সংবিধান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। এই সনদের মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে সকল রক্তারক্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এমনকি এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নীতির গোড়াপত্তন করা হয় এবং সকল গোত্রের মধ্যে জবাবদিহিতার অনুভুতি সৃষ্টি করা হয়। আওস, খাযরাজ উভয় গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এছাড়াও প্রধানত তিনটি ইহুদী গোত্র (বনু কাইনুকা, বনু কুরাইজা এবং বনু নাদির)। এগুলোসহ মোট আটটি গোত্র এই সনদে স্বাক্ষর করেছিল। এই সনদের মাধ্যমে মদীনা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)হন তার প্রধান।

মক্কার সাথে বিরোধ ও যুদ্ধ:

মদীনায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই মক্কার সাথে এর সম্পর্ক দিন দিন খারাপ হতে থাকে। মক্কার কুরাইশরা মদীনা রাষ্ট্রের ধ্বংসের জন্য যুদ্ধংদেহী মনোভাব পোষণ করতে থাকে। মুহাম্মাদ(স)মদীনায় এসে আশেপাশের সকল গোত্রের সাথে সন্ধি চুক্তি স্থাপনের মাধ্যমে শান্তি স্থাপনে অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু মক্কার কুরাইশরা গৃহত্যাগী সকল মুসলিমদের সম্পত্তি ক্রোক করে। এই অবস্থায় ৬২৪ সালে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)৩০০ সৈন্যের একটি সেনাদলকে মক্কার একটি বাণিজ্যিক কাফেলাকে বাঁধা দেয়ার উদ্দেশ্যে পাঠায়। কারণ উক্ত কাফেলা বাণিজ্যের নাম করে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করছিল। কুরাইশরা তাদের কাফেলা

রক্ষায় সফল হয়। কিন্তু এই প্রচেষ্টার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য যুদ্ধের ডাক দেয়। আত্মরক্ষামূলক এই যুদ্ধে মুসলিমরা সৈন্য সংখ্যার দিক দিয়ে কুরাইশদের এক তৃতীয়াংশ হয়েও বিজয় অর্জন করে। এই যুদ্ধ বদর যুদ্ধ নামে পরিচিত যা ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মার্চ তারিখে সংঘটিত হয়। মুসলিমদের মতে এই যুদ্ধে আল্লাহ মুসলিমদের সহায়তা করেছিলেন। যাহোক, এই সময় থেকেই ইসলামের সশস্ত্র ইতিহাসের সূচনা ঘটে। এরপর ৬২৫ সালের ২৩ মার্চে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিতে হয়। এতে প্রথম দিকে মুসলিমরা পরাজিত হলেও শেষে বিজয়ীর বেশে মদীনায় প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। কুরাইশরা বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও চূড়ান্ত মুহূর্তের নীতিগত দূর্বলতার কারণে পরাজিতের বেশে মক্কায় প্রবেশ করে। ৬২৭ সালে আবু সুফিয়ান কুরাইশদের আরেকটি দল নিয়ে মদীনা আক্রমণ করে। কিন্তু এবারও খন্দকের যুদ্ধে মুসলিমদের কাছে পরাজিত হয়। যুদ্ধ বিজয়ে উৎসাহিত হয়ে মুসলিমরা আরবে একটি প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হয়। ফলে আশেপাশের অনেক গোত্রের উপরই মুসলিমরা প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়।

মদীনার ইহুদিদের সাথে সম্পর্কঃ

কিন্তু এ সময় মদীনার বসবাসকারী ইহুদীরা ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য হুমকী হয়ে দেখা দেয়। মূলত ইহুদীরা বিশ্বাস করতনা যে, একজন অ-ইহুদী শেষ নবী হতে পারে। এজন্য তারা কখনই ইসলামের আদর্শ মেনে নেয়নি এবং যখন ইসলামী রাষ্ট্রের শক্তি বুঝতে পারে তখন তারা এর বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)প্রতিটি যুদ্ধের পরে একটি করে ইহুদী গোত্রের উপর আক্রমণ করেন। বদর ও উহুদের যুদ্ধের পর বনু কাইনুকা ও বনু নাদির গোত্র সপরিবারে মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়; আর খন্দকের পর সকল ইহুদীকে মদীনা থেকে বিতাড়ন করা হয়।মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এই ইহুদী বিদ্বেশের দুটি কারণের উল্লেখ পাওয়া যায়, একটি ধর্মীয় এবং অন্যটি রাজনৈতিক। ধর্মীয় দিক দিয়ে চিন্তা করলে আহলে কিতাব হয়েও শেষ নবীকে মেনে না নেয়ার শাস্তি ছিল এটি। আর রাজনৈতিকভাবে চিন্তা করলে, ইহুদীরা মদীনার জন্য একটি হুমকী ও দুর্বল দিক ছিল। এজন্যই তাদেরকে বিতাড়িত করা হয়।

হুদাইবিয়ার সন্ধিঃ

কুরআনে যদিও মুসলিমদের হজ্জ্বের নিয়ম ও আবশ্যকীয়তা উল্লেখ ককরা আছে, তথাপি কুরাইশদের শত্রুতার কারণে মুসলিমরা হজ্জ্ব আদায় করতে পারছিল না। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক দিব্যদর্শনে দেখতে পান তিনি হজ্জ্বের জন্য মাথা কামাচ্ছেন। এ দেখে তিনি হজ্জ্ব করার জন্য মনস্থির করেন এবং ৬ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে হজ্জ্বের উদ্দেশ্যে ১৪০০ সাহাবা নিয়ে মদীনার পথে যাত্রা করেন। কিন্তু এবারও কুরাইশরা বাঁধা দেয়। অগত্যা মুসলিমরা মক্কার উপকণ্ঠে হুদাইবিয়া নামক স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে। এখানে কুরাইশদের সাথে মুসলিমদের একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা ইতিহাসে হুদাইবিয়ার সন্ধি নামে সুপরিচিত। এই সন্ধি মতে মুসলিমরা সে বছর হজ্জ্ব করা ছাড়াই মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে। সন্ধির অধিকাংশ শর্ত মুসলিমদের বিরুদ্ধে গেলেও মুহাম্মাদ এই চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন।

বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কদের কাছে পত্র প্রেরণঃ

রাসূল (সাঃ)সারা বিশ্বের রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। সুতরাং পৃথিবীর সব জায়গায় ইসলামের আহ্বান পৌঁছ দেয়া তাঁর দায়িত্ব ছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর কুরাইশ ও অন্যান্য আরব গোত্রগুলো থেকে আশ্বস্ত হয়ে এ কাজে মননিবেশ করেন। সেসময়ে পৃথিবীর প্রধান রাজশক্তিগুলো ছিল ইউরোপের রোম সাম্রাজ্য (the holy roman empire),এশিয়ার পারস্য সাম্রাজ্য এবং আফ্রিকার হাবশা সাম্রাজ্য। এছাড়াও মিশরের 'আযীয মুকাউকিস',ইয়ামামার সর্দার এবং সিরিয়ার গাসসানী শাসনকর্তাও বেশ প্রতাপশালী ছিল। তাই ষষ্ঠ হিজরীর জিলহজ্জ মাসের শেষদিকে একইদিনে এদেঁর কাছে ইসলামের আহ্বানপত্রসহ ছয়জন দূত প্রেরণ করেন।

প্রেরিত দূতগণের তালিকাঃ

1. দাহিয়া ক্বালবী (রাঃ)কে রোমসম্রাট কায়সারের কাছে।
2. আবদুল্লাহ বিন হুযাফা (রাঃ)কে পারস্যসম্রাট পারভেজের কাছে।
3. হাতিব বিন আবূ বুলতা'আ (রাঃ) কে মিশরৈর শাসনকর্তার কাছে।
4. আমর বিন উমাইয়া (রাঃ) কে হাবশার রাজা নাজ্জাশীর কাছে।
5. সলীত বিন উমর বিন আবদে শামস (রাঃ) কে ইয়ামামার সর্দারের কাছে।
6. শুজাইবনে ওয়াহাব আসাদী (রাঃ)কে গাসসানী শাসক হারিসের কাছে।

শাসকদের মধ্য হতে শুধুমাত্র বাদশাহ নাজ্জাসী ছাড়া আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেননি।

মক্কা বিজয় :

হিজরি ৮ম সনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা অভিযান চালানোর ইচ্ছা করেন। ১০ই রমজান ১০০০০ সদস্যের বাহিনী নিয়ে মক্কাঅভিমুখে রওয়ানা হন। মক্কায় যুদ্ধ ছাড়াই প্রবেশ করেন। কুরাইশরা আত্মসমর্পন করে। আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে বিজয় দান করেন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফ তাওয়াফ করে কা'বার অভ্যন্তরে দু'রাকআত নামায আদায় করেন। অতঃপর ভেতরে রাখা সব মুর্তি চুর্ণ বিচুর্ণ করেন। কা'বা শরীফের দরজায় দাড়িয়ে মসজিদে হারামে কাতারবদ্ধভাবে অপেক্ষারত সমবেত কুরাইশদেরকে বলেন, হে কুরাইশরা ! তোমাদের সাথে কি আচরণ করবো বলে মনে করো। তাঁরা বলে ভালো আচরণ, দয়াবান ভাই, দয়াবান ভাই এর পুত্র। তিনি বলেন, যাও তোমরা সবাই মুক্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষমার উজ্জল ও বৃহত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করেন। তারাই সেই লোক যারা তাঁর সাহাবাদের উপর চালিয়ে ছিল অত্যাচারের স্ট্রীম রোলার, খুন করেছে অনেককে, কষ্ট দিয়েছে স্বয়ং তাঁকে এবং নিজের মাতৃভুমি থেকে বহিস্কার করেছে। মক্কা বিজয়ের পর লোকজন দলে দলে আল্লাহর দ্বীনের ছায়াতলে সমবেত হয়। হিজরি ১০ম সনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ করেন। এটা তাঁর একমাত্র হজ্জ ছিল। তাঁর সাথে এক লাখ লোক হজ্জ করেন। হজ্জ পালন শেষে তিনি মদীনায় প্রত্যাগমন করেন।

মহানবী সাঃ এর বিদায় হজ্জের ভাষণঃ

আরবি দশম হিজরী সনের পবিত্র হজের সময় প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার সাহাবির সামনে জিলহজ মাসের ৯ তারিখ বিকালে আরাফাতের ময়দানে যে বক্তব্য পেশ করেন এবং পরদিন ১০ জিলহজ ঈদের দিন ও কোরবানির দিন প্রদান করেছিলেন। তাকেই বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণ বলে। এই দুইদিনে দেওয়া তাঁর বক্তব্য বিদায় হজের ভাষণ হিসেবে পরিচিত। এটি ছিল মানব জাতির উদ্দেশে মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের সর্বশেষ ভাষণ। এই ভাষণে মহানবী (সা.) বলেছিলেন:

হে লোক সকল! আল্লাহ তাআলা বলেন: ‘হে মানবজাতি! আমি তোমাদিগকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত, যে সর্বাধিক পরহেজগার। (আল-কোরআন, পারা: ২৬, সূরা-৪৯ হুজুরাত, আয়াত: ১৩)। সুতরাং কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের; কোনো আরবের ওপর কোনো অনারবের, এমনিভাবে শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের এবং কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই; তবে তাকওয়ার ভিত্তিতে। সব মানুষ আদম (আ.)-এর সন্তান; আর আদম (আ.) মাটি দ্বারা সৃষ্ট।

হে সভ্যমণ্ডলী! এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, সব মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই; তোমাদের অধীনদের (দাস-দাসী) প্রতি খেয়াল রাখবে, তোমরা যা খাবে, তাদের তা খাওয়াবে, তোমরা যা পরিধান করবে, তাদেরও তা পরাবে। সাবধান! ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না; কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধর্মীয় বিষয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।

হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত করবে; পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, রমজান মাসে রোজা রাখবে, সন্তুষ্টচিত্তে সম্পদের জাকাত প্রদান করবে, স্বীয় প্রভুর ঘরে এসে হজ পালন করবে এবং নেতাদের আনুগত্য করবে; তাহলে তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। হে মানবমণ্ডলী! তোমরা আমার কথা শোনো। হয়তো আমি এ বছরের পর এখানে আর কখনো তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব না।

হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এই দিন ও এই মাসের মতো তোমাদের ওপর নিষিদ্ধ ও পবিত্র তোমাদের প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত। অচিরেই তোমরা তোমাদের মহান প্রভুর সাক্ষাতে উপনীত হবে। তখন তিনি তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। আমি তো তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। তোমাদের কারও কাছে যদি

কোনো আমানত গচ্ছিত থাকে, তা তার প্রাপকের কাছে অবশ্যই পৌঁছে দেবে।নিশ্চয়ই সব ধরনের সুদ রহিত করা হলো। তবে তোমাদের মূলধন বহাল থাকবে। মহান আল্লাহ ফয়সালা দিয়েছেন যে আর কোনো সুদ নয়। আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবের সব সুদ রহিত করা হলো। তোমরা কোনো জুলুম করবে না, বরং তোমাদের প্রতিও কোনো জুলুম করা হবে না। জাহিল যুগের যত রক্তের দাবি, তা সব রহিত করা হলো। প্রথম আমি রিবয়া ইবন হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিবের শিশুপুত্রের রক্তের দাবি রহিত করলাম।

হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের এই ভূখণ্ডের উপাস্য হওয়ার ব্যাপারে চিরদিনের জন্য নিরাশ হয়ে গেছে। তবে এ ছাড়া তোমরা যা তুচ্ছ মনে করে থাকো, এমন বহু কাজ রয়েছে, যাতে তার আনুগত্য করলে সে খুশি হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে তার থেকে সাবধান থেকো। হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই মাসসমূহকে আগ-পিছ করা বস্তুত কুফরিকেই বৃদ্ধি করা, যা দ্বারা কাফিররা বিভ্রান্ত হয়। অথচ কাল (সময়) তার নিজস্ব নিয়মে প্রকৃতিতে আবর্তিত হয়।

হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক প্রাপকের (উত্তরাধিকারীর) জন্য তার অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি নিজের জন্মদাতা ছাড়া অন্যের সঙ্গে নিজের বংশসূত্র স্থাপন করে এবং যে নিজ মনিব ছাড়া অন্যকে মনিব বলে স্বীকার করে, তার ওপর আল্লাহর লানত। সব ঋণ পরিশোধের যোগ্য ও অধিকার, ধারকৃত বস্তু ফেরতযোগ্য, উপঢৌকনেরও বিনিময় প্রদান করা উচিত, জামিনদার জরিমানা আদায় করতে বাধ্য থাকবে। কারও জন্য তার অপর ভাইয়ের কোনো কিছু বৈধ নয়, যতক্ষণ না সে নিজে সন্তুষ্টচিত্তে তা প্রদান না করে। কোনো নারীর জন্য তার স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্বামীর অর্থ-সম্পদ থেকে কাউকে কিছু দেওয়া বৈধ নয়। তোমরা কখনো একে অন্যের ওপর জুলুম কোরো না। নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের অধিকার রয়েছে এবং তোমাদের ওপরও তাদের অধিকার আছে। তাদের ওপর তোমাদের অধিকার হলো তারা তোমাদের বিছানায় কাউকে কখনো স্থান দেবে না, যা তোমাদের সবার অপছন্দনীয় এবং তাদের ওপর তোমাদের অধিকার হচ্ছে, তারা কোনো অশ্লীল বা লজ্জাকর কাজে লিপ্ত হবে না। তোমরা নারীদের প্রতি কল্যাণকামী হও। কারণ, তারা তোমাদের কাছে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। তারা তো নিজেদের জন্য কিছু করে না। তোমরা তো তাদের আল্লাহর আমানতস্বরূপ গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে তাদের সতীত্বের ওপর অধিকার লাভ করেছ (বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দাম্পত্য অধিকার লাভ করেছ)।

অতএব, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা আমার কথা অনুধাবন করো। আমি তো পৌঁছে দিয়েছি। আমি তোমাদের মাঝে এমন সুস্পষ্ট দুটি বিষয় (বিধান) রেখে গেলাম, যা দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না: আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবী (সা.)এর সুন্নাহ।

হে মানবমণ্ডলী! তোমরা আমার কথা শোনো ও অনুধাবন করো। তোমরা অবশ্যই জেনে রেখো, প্রত্যেক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই এবং মুসলিমগণ ভ্রাতৃপ্রতিম। সুতরাং কোনো মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের কোনো কিছু বৈধ নয়, যতক্ষণ না সে সন্তুষ্টচিত্তে তাকে তা প্রদান করে। অতএব, তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম কোরো না। সবাই শোনো, এখানে উপস্থিত লোকেরা যেন এই বার্তাগুলো অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌঁছে দেয়। হয়তো অনেক অনুপস্থিত লোক উপস্থিত শ্রোতা অপেক্ষা অধিক হেফাজতকারী হবে।শোনো! তোমরা আল্লাহর দরবারে আমার ব্যাপারে যখন জিজ্ঞাসিত হবে, বলো তখন কী উত্তর দেবে? উপস্থিত সাহাবিরা উত্তর দিলেন, আপনার ওপর অর্পিত দায়িত্ব আপনি যথাযথ পালন করেছেন; ইয়া রাসুলুল্লাহ! (হে আল্লাহর রাসুল!) আপনি রিসালাতের হক পূর্ণরুপে আদায় করেছেন এবং উম্মতকে কল্যাণপথের দিশা দিয়েছেন। তারপর তিনি সাহাবিদের উদ্দেশে বললেন, ‘আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?উপস্থিত সাহাবিরা সমস্বরে বলে উঠলেন, ‘হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি পৌঁছিয়েছেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) আকাশের দিকে শাহাদত অঙ্গুলি উত্তোলন করে বললেন, ‘হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন; হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন; হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। অতঃপর নাজিল হয়: ‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ধর্ম হিসেবে ইসলাম দিয়ে আমি সন্তুষ্ট হলাম।

মৃত্যুঃ

বিদায় হজ্জ থেকে ফেরার পর হিজরী ১১ সালের সফর মাসে মুহাম্মদ (সাঃ) জ্বরে আক্রান্ত হন। জ্বরের তাপমাত্রা প্রচন্ড হওয়ার কারণে পাগড়ির ওপর থেকেও উষ্ণতা অনুভূত হচ্ছিল। অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি এগারো দিন নামাজের ইমামতি করেন। অসুস্থতা তীব্র হওয়ার পর তিনি সকল স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে আয়েশা (রাঃ) এর কামরায় অবস্থান করতে থাকেন। তাঁর কাছে সাত কিংবা আট দিনার ছিল,মৃত্যুর একদিন পূর্বে তিনি এগুলোও দান করে দেন। বলা হয়, এই অসুস্থতা ছিল খাইবারের এক ইহুদি নারীর তৈরি বিষ মেশানো খাবার গ্রহণের কারণে। অবশেষে ১১ হিজরী সালের রবিউল আউয়াল মাসের ১ তারিখ সন্ধায় তিনি মৃত্যবরণ

করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। আলী (রাঃ) তাকেঁ গোসল দেন এবং কাফন পরান। আয়েশ (রাঃ)এর কামরার যে স্থানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন,জানাযার পর সেখানেই তাকেঁ দাফন করা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য:

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন সকল প্রকার মানবিক গুণে গুণান্বিত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বন্ধু ও শত্রু সকলের মুখে সমভাবে তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুর্যের প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে। কঠোর প্রতিপক্ষ আবু সুফিয়ান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের সম্মুখে অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁর সততা, আমানতদারী ও সচ্চরিত্রতার উচ্চ প্রশংসা করেছেন (বুখারী হা/৭)। আল্লাহপাক নিজেই স্বীয় রাসূলের প্রশংসায় বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ‘নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী’ (ক্বলম ৬৮/৪)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ ‘আমি প্রেরিত হয়েছি সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য’। তাই দেখা যায়, নবুঅত-পূর্ব জীবনে সকলের নিকটে প্রশংসিত হিসাবে তিনি ছিলেন ‘আল-আমীন’ (বিশ্বস্ত, আমানতদার) এবং নবুঅত পরবর্তী জীবনে চরম শত্রুতাপূর্ণ পরিবেশেও তিনি ছিলেন ধৈর্য ও সহনশীলতা, সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা, দয়া ও সহমর্মিতা, পরোপকার ও পরমত সহিষ্ণুতা, লজ্জা ও ক্ষমাশীলতা প্রভৃতি অনন্য গুণাবলীর জীবন্ত প্রতীক। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا ‘নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে’ (আহযাব ৩৩/২১)। তাঁর অনুপম চরিত্রমাধুর্য ও অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ পূর্ণভাবে বর্ণনা করা ঐরূপ অসম্ভব, যেরূপ পূর্ণচন্দ্রের সৌন্দর্য বর্ণনা করা এবং খালি চোখে আকাশের তারকারাজি গণনা করা অসম্ভব। তবুও দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু চারিত্রিক নমুনা ও বৈশিষ্ট্য নিম্নে তুলে ধরা হ’ল।-

(১) বাকরীতি (تعبير الكلام) : তিনি হাসিমুখে বিশুদ্ধ, মার্জিত ও সুন্দরভাবে কথা বলতেন। যা দ্রুত শ্রোতাকে আকৃষ্ট করত। আর একেই লোকেরা ‘জাদু’ বলত। তাঁর উন্নত ও শুদ্ধভাষিতায় মুগ্ধ হয়েই ইয়ামনের যেমাদ আযদী মুসলমান হয়ে যান।নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও ‘তিনি ছিলেন আরব ও অনারবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ’। এমনকি ‘হাদীছ জাল হওয়ার অন্যতম নিদর্শন হ’ল তার শব্দসমূহের উচ্চ মানবিশিষ্ট না হওয়া’ (ফাৎহুল মুগীছ)। একারণেই আরবী সাহিত্যে কুরআন ও হাদীছের প্রভাব সবার উপরে। বরং বাস্তব কথা এই যে, এই ভাষার বুকে কুরআন ও হাদীছের অবস্থানের কারণেই তা বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। আর

কুরআন ও হাদীছের সর্বোচ্চ বাকরীতি ও আলংকরিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই আরবী ভাষা ও সাহিত্য সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন হ’তে পেরেছে এবং ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। অথচ হিব্রু, খালেদী, ল্যাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি পৃথিবীর প্রাচীন ভাষা সমূহ বিলুপ্ত হয়ে গেছে অথবা বিলুপ্তির পথে।

(২) ক্রোধ দমন শৈলী (أسلوب كظم الغيظ) : ক্রোধ দমনের এক অপূর্ব ক্ষমতা ছিল তাঁর মধ্যে। তিনি বলতেন, প্রকৃত বীর সেই, যে ক্রোধের সময় নিজেকে দমন করতে পারে।আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি কখনো কাউকে নিজের স্বার্থে নিজ হাতে মারেননি। কোন মহিলা বা খাদেমকে কখনো প্রহার করেননি’।

(৩) হাসি-কান্না (الضحك والبكاء) : তিনি মৃদু হাস্য করতেন। কখনোই অট্টহাস্য করতেন না। সদা প্রফুল্ল থাকতেন। কখনোই গোমড়ামুখো থাকতেন না। তবে দুশ্চিন্তায় পড়লে তার ছাপ চেহারায় পড়ত এবং তখন তিনি ছালাতে রত হ’তেন। ছোটখাট হালকা রসিকতা করতেন। যেমন, (ক) একদিন স্ত্রী আয়েশার নিকটে এসে তার এক বৃদ্ধা খালা রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য আল্লাহর নিকটে দো‘আ করুন যেন তিনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে অমুকের মা! কোন বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একথা শুনে উক্ত মহিলা কাঁদতে শুরু করল। তখন আয়েশা বললেন, তাদের কি দোষ? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি কুরআনে পড়োনি যে আল্লাহ বলেছেন, إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً- فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا- عُرُبًا أَتْرَابًا- لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ‘আমরা জান্নাতী নারীদের বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি’। ‘অতঃপর তাদের চিরকুমারী করেছি’। সদা সোহাগিনী, সমবয়স্কা’। ‘ডান সারির লোকদের জন্য’ (ওয়াক্বি‘আহ ৫৬/৩৫-৩৮)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘জান্নাতবাসী নারী-পুরুষ সবাই ৩০ থেকে ৩৩ বছর বয়সী হবে’।

(খ) এক সফরে তিনি দেখেন যে, মহিলাদের নিয়ে তাঁর কৃষ্ণকায় উষ্ট্রচালক গোলাম আনজাশাহ দ্রুত গতিতে উট হাঁকিয়ে চলেছে। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ، لاَ تَكْسِرِ الْقَوَارِيرِ ‘ধীরে চালাও হে আনজাশা! কাঁচের পাত্রগুলি ভেঙ্গে ফেল না’।[9] (গ) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের সঙ্গে মিশতেন। এমনকি আমার ছোট ভাই আবু ওমায়ের একটি ‘নুগায়ের’ অর্থাৎ লাল ঠোট ওয়ালা চড়ুই জাতীয় পাখি পুষত। যা নিয়ে

সে খেলা করত। রাসূল (ছাঃ) যখন এসে তাকে খেলতে দেখতেন, তখন বলতেন, يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ 'হে আবু ওমায়ের! কি করছে তোমার নুগায়ের?

ছালাতের মধ্যে বিশেষ করে তাহাজ্জুদের ছালাতে তিনি আল্লাহর ভয়ে কাঁদতেন। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখলে তার অন্তর কেঁদে উঠতো এবং তার অভাব দূরীকরণে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। চাচা হামযা, কন্যা যয়নব ও পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুতে তিনি শিশুর মত হু হু করে কেঁদেছিলেন। তিনি অন্যের মুখে কুরআন শুনতে পসন্দ করতেন। একবার ইবনু মাসঊদের মুখে সূরা নিসা শুনে তাঁর চোখ বেয়ে অবিরল ধারে অশ্রু প্রবাহিত হয়। অতঃপর ৪১ আয়াতে পৌঁছলে তিনি তাকে থামতে বলেন।

(৪) বীরত্ব ও ধৈর্যশীলতা (الشجاعة والصبر) : কঠিন বিপদের মধ্যেও তিনি দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় ধৈর্যশীল থাকতেন। মাক্কী জীবনের আতংকময় পরিবেশে এবং মাদানী জীবনের প্রতি মুহূর্তে জীবনের হুমকির মধ্যেও তাঁকে কখনো ভীত-বিহবল ও অধৈর্য হ'তে দেখা যায়নি। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ঘনঘোর যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিতাম। তিনিই সর্বদা শত্রুর নিকটবর্তী থাকতেন (আহমাদ হা/৬৫৪, সনদ ছহীহ)। শত্রুর ভয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাবার কোন ঘটনা তাঁর জীবনে নেই। অভাবে-অনটনে, দুঃখে-বেদনায়, সর্বাবস্থায় তিনি কঠিন ধৈর্য অবলম্বন করতেন। এমনকি তিনদিন না খেয়ে পেটে পাথর বেঁধে সৈন্যদের সাথে অবর্ণনীয় কষ্টে খন্দক খোঁড়ার কাজে অংশ নিলেও চেহারায় তার প্রকাশ ঘটতো না। বরং সৈন্যদের সাথে আখেরাতের কবিতা পাঠের মধ্য দিয়েই খুশীমনে নিজ হাতে খন্দক খুঁড়েছেন। শত্রুদের শত্রুতা যতই বৃদ্ধি পেত তাঁর ধৈর্যশীলতা ততই বেড়ে যেত। ওহোদ ও হোনায়েন যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব ও অসম সাহসিকতা ছিল অচিন্তনীয়।

আনাস (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে চলছিলাম। এসময় তাঁর উপর মোটা জরিদার একটি নাজরানী চাদর শোভা পাচ্ছিল। হঠাৎ এক বেদুঈন এসে তাঁর চাদর ধরে এমন হেচকা টান দিল যে, তিনি বেদুঈনের বুকে গিয়ে পড়েন। এতে আমি দেখলাম যে, জোরে টান দেওয়ার কারণে রাসূল (ছাঃ)-এর ঘাড়ের উপর চাদরের দাগ পড়ে গেল। অতঃপর লোকটি বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর মাল যা তোমার কাছে আছে, তা থেকে

আমাকে দেবার নির্দেশ দাও (يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِى مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِيْ عِنْدَكَ)। তখন রাসূল (ছাঃ) তার দিকে তাকালেন ও হাসলেন। অতঃপর তাকে কিছু দান করার জন্য আদেশ দিলেন’।

উক্ত ঘটনায় রাসূল (ছাঃ)-এর অতুলনীয় ধৈর্য ও দানশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এরূপ অসংখ্য ঘটনা তাঁর জীবনে রয়েছে।

(৫) সেবা পরায়ণতা (عيادة المرضى) **:** কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তার বাড়ীতে গিয়ে সেবা করতেন ও সান্ত্বনা দিতেন। তার জন্য দো‘আ করতেন। কি খেতে মন চায় শুনতেন। ক্ষতিকর না হ’লে তা দেবার ব্যবস্থা করতেন। নিজের ইহূদী কাজের ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তার বাড়ীতে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেন ও পরিচর্যা করেন। এ সময় তিনি বলেন, তুমি ইসলাম কবুল কর। তখন ছেলেটি তার বাপের দিকে তাকাল যে তার নিকটে বসা ছিল। বাপ তাকে বলল, أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ ‘তুমি আবুল ক্বাসেম-এর কথা মেনে নাও। তখন ছেলেটি কালেমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম কবুল করল। অতঃপর মারা গেল। এরপর রাসূল (ছাঃ) বের হবার সময় বললেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَنْقَذَهُ بِىْ مِنَ النَّار ‘আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, যিনি তাকে আমার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন’।

(৬) সহজ পন্থা অবলম্বন (اتخاذ الطريقة السهلة) **:** হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে যখনই দু’টি কাজের এখতিয়ার দেওয়া হ’ত, তখন তিনি সহজটি বেছে নিতেন। যদি তাতে গুনাহের কিছু না থাকত। তিনি নিজের জন্য কোন অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতেন না। কিন্তু আল্লাহর জন্য হ’লে প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়তেন না’। ওয়ায-নছীহত করতেন, যতক্ষণ না মানুষ বিব্রতবোধ করে। নফল ছালাত চুপে চুপে আদায় করতেন, যাতে অন্যের কষ্ট না হয়। তিনি বলতেন, فَاكْلَفُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْن ‘তোমরা এমন আমল কর, যা তোমাদের সাধ্যে কুলায়’।

(৭) দানশীলতা (الجود) **:** যতক্ষণ তাঁর কাছে কিছু থাকত, ততক্ষণ তিনি দান করতেন। রামাযান মাসে তা হয়ে যেত كَالرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ ‘প্রবহমাণ বায়ুর মত’। তিনি ছাদাক্বা গ্রহণ করতেন না। কিন্তু হাদিয়া নিতেন। অথচ তা নিজের প্রয়োজনে যৎসামান্য ব্যয় করে সবই দান করে দিতেন। তিনি বলতেন, لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِه ‘কেউ অতক্ষণ প্রকৃত মুমিন হ’তে পারবে না, যতক্ষণ না সে অপরের জন্য তাই-ই ভালবাসবে, যা

সে নিজের জন্য ভালবাসে’।[17] তিনি বলতেন, وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيْمَانُ فِيْ قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا 'একজন বান্দার হৃদয়ে ঈমান ও কৃপণতা কখনো একত্রিত হ'তে পারে না'।

(৮) লজ্জাশীলতা (الحياء) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বদা দৃষ্টি অবনত রাখতেন। কখনোই অন্যের উপরে নিজের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন না। তিনি কারু মুখের উপর কোন অপছন্দনীয় কথা বলতে লজ্জা পেতেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِى خِدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِى وَجْهِه- 'তিনি পর্দানশীন কুমারী মেয়েদের চাইতে অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। যখন তিনি কিছু অপছন্দ করতেন, তখন তাঁর চেহারা দেখে আমরা বুঝে নিতাম'। কারু কোন মন্দ কাজ দেখলে সরাসরি তাকে মন্দ না বলে সাধারণভাবে নিষেধ করতেন, যাতে লোকটি লজ্জা না পায়। অথচ বিষয়টি বুঝতে পেরে সে নিজেই সংশোধন হয়ে যায়।

(৯) বিনয় ও নম্রতা (التواضع والتذلل) **:** তিনি ছিলেন বিনয়ী ও নিরহংকার চরিত্রের মানুষ। তিনি সবাইকে মানুষ হিসাবে সমান জ্ঞান করতেন। উঁচু-নীচু ভেদাভেদ করতেন না। তাঁকে দেখে সম্মানার্থে দাঁড়াতে ছাহাবীগণকে নিষেধ করতেন। দাস-দাসীদের নিকটে কখনোই অহংকার প্রকাশ করতেন না। তাদের কোন কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে উহ্ শব্দটি করতেন না। বরং তাদের কাজে নিজে সাহায্য করতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি ১০ বছর রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমত করেছি। কিন্তু তিনি কখনো আমাকে কোন কাজের জন্য কৈফিয়ত তলব করেননি।অবশ্য তার অর্থ এটা নয় যে, অন্যায় কথা বা কাজের জন্য তিনি কাউকে ধমকাতেন না বা ভৎর্সনা করতেন না। যেমন তিনি উসামা ও খালেদকে ধমকিয়েছেন এবং তাদের ব্যাপারে তিনি দায়ী নন বলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি সর্বদা আগে সালাম দিতেন ও মুছাফাহার জন্য আগে হাত বাড়িয়ে দিতেন। ছাহাবীগণকে সম্মান করে অথবা আদর করে কখনো কখনো তাদের উপনামে ডাকতেন। যেমন আব্দুল্লাহ বিন ওছমানকে তার উপনামে 'আবুবকর', আব্দুর রহমান বিন ছাখারকে 'আবু হুরায়রা' (ছোট বিড়ালের বাপ), আলীকে 'আবু তোরাব' (ধূলি ধুসরিত), হুযায়ফাকে 'নাওমান' (ঘুম কাতর), অতি সতর্ক ও সাবধানী হওয়ার কারণে আনাসকে 'যুল উযনাইন' (দুই কান ওয়ালা), সফরে অধিক বোঝা বহনকারী হিসাবে মুক্তদাস মিহরান বিন ফার্রূখ-কে 'সাফীনাহ' (নৌকা) বলে ডাকতেন।[23] উল্লেখ্য যে, খুশী অবস্থায় উপনামে ডাকা আরবীয় রীতি হিসাবে প্রসিদ্ধ।

(ক) দুগ্ধদায়িনী মা, রোগী, বৃদ্ধ, মুসাফির ইত্যাদি বিবেচনায় তিনি জামা'আতে ছালাত সংক্ষেপ করতেন।

(খ) রাসূল (ছাঃ)-এর 'আযবা' (الْعَضْبَاء) নাম্নী একটা উষ্ট্রী ছিল। সে এতই দ্রুতগামী ছিল যে, কোন বাহন তাকে অতিক্রম করতে পারত না। কিন্তু একদিন এক বেদুঈনের সওয়ারী আযবা-কে অতিক্রম করে গেল। বিষয়টি মুসলমানদের কাছে কষ্টদায়ক মনে হ'ল। তখন রাসূল (ছাঃ) তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন,إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَه 'দুনিয়াতে আল্লাহর নীতি এটাই যে, কাউকে উঁচু করলে তাকে নীচুও করে থাকেন'।[25]

(গ) জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে خَيْرُ الْبَرِيَّة (সৃষ্টির সেরা) বলে সম্বোধন করলে তিনি তাকে বলেন, ذَاكَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَم 'তিনি হ'লেন ইবরাহীম (আঃ)'।

(ঘ) একবার এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে এসে ভয়ে বিহবল হয়ে পড়ে। তখন তিনি তাকে বলেন,هَوِّنْ عَلَيْكَ فَإِنِّىْ لَسْتُ بِمَلِكٍ إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ تَأْكُلُ الْقَدِيْد 'স্থির হও! আমি কোন বাদশাহ নই। আমি একজন কুরায়েশ মহিলার সন্তান মাত্র। যিনি শুকনা মাংস ভক্ষণ করতেন'। উল্লেখ্য যে, আরবের গরীব লোকেরা শুকনা মাংস খেতেন। এ সকল ঘটনায় বাস্তব জীবনে রাসূল (ছাঃ)-এর বিনয় ও নম্রতা অবলম্বনের ও নিরহংকার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

১০) সংসার জীবনে (فى حياته العائلية) : হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) নিজের জুতা নিজেই সেলাই করতেন ও কাপড়ে তালি লাগাতেন। নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন, সংসারের কাজ নিজ হাতে করতেন, নিজে বকরী দোহন করতেন, কাপড় ছাফ করতেন ও নিজের কাজ নিজে করতেন'।[28]

স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশা (রাঃ) ছিলেন কুমারী ও সবচেয়ে কম বয়স্কা। তাই রাসূল (ছাঃ) কখনো কখনো সাথীদের এগিয়ে দিয়ে নিজে তার সাথে দৌড়ে পাল্লা দিতেন। তাতে আয়েশা জিতে যেতেন। আবার আয়েশা ভারী হয়ে গেলে প্রতিযোগিতায় তিনি হেরে যান'। তাকে নিয়ে বিয়ে বাড়ীতে বেদুঈন মেয়েদের নাচ-গান শুনেছেন। রাসূল (ছাঃ) যে কত বাস্তববাদী ও সংস্কৃতিমনা ছিলেন, এতে তার প্রমাণ মেলে। খায়বর যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে নব পরিণীতা স্ত্রী ছাফিইয়াকে উটে সওয়ার করার জন্য তিনি নীচু হয়ে নিজের হাঁটু পেতে দেন। অতঃপর ছাফিইয়াহ নবীর হাঁটুর উপরে পা রেখে উটে সওয়ার হন'।

১১) সমাজ জীবনে (فى حياة الإجتماعية) : বন্ধুদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। নিজের ও স্ত্রী সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রক্ষা করতেন। কারু ক্ষতি হতে পারে এমন কাজ হ'তে দূরে থাকতেন। পরনিন্দা ও পরচর্চা হতে বেঁচে থাকতেন। সঙ্গী-সাথীদের খোঁজ-খবর নিতেন। তিনি শত্রুদের দেওয়া কষ্টে ও মূর্খদের বাড়াবাড়িতে ধৈর্য ধারণ করতেন। তিনি মন্দকে মন্দ বলতেন ও ভালকে ভাল বলতেন। কিন্তু সর্বদা মধ্যপন্থী আচরণ করতেন।[32] তিনি সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকতেন। তাঁর নিকটে লোকেদের মর্যাদার ভিত্তি ছিল তাক্বওয়া বা আল্লাহভীরুতা (আহমাদ হা/২৩৫৩৬)। সমাজের দুর্বল শ্রেণীর প্রতি তাঁর করুণা ছিল সর্বাধিক। তিনি বলতেন, اَبْغُونِىْ فِي الضُّعَفَاءِ فَإِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ 'তোমরা আমাকে দুর্বল শ্রেণীর মধ্যে তালাশ করো। কেননা তোমরা রূযিপ্রাপ্ত হয়ে থাক এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাক দুর্বল শ্রেণীর মাধ্যমে'।[33] অর্থাৎ তাদের প্রতি সদাচরণের মাধ্যমে তোমরা আমার সন্তুষ্টি তালাশ কর।

সমাজ সংস্কারে তিনি জনমতের মূল্যায়ন করতেন। যেমন-

(১) কুরায়েশদের নির্মিত কা'বাগৃহে ইবরাহীম (আঃ) নির্মিত কা'বাগৃহ থেকে কিছু অংশ ছেড়ে রাখা হয়েছিল। ছাড়া অংশটিকে 'রুকনে হাত্বীম' বলা হয়। আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) চেয়েছিলেন ওটাকে ইবরাহীমী ভিতের উপর কা'বাগৃহের মধ্যে শামিল করতে এবং কা'বাগৃহের দু'টো দরজা করতে। কিন্তু জনমত বিগড়ে যাবার ভয়ে তিনি তা করেননি। এবিষয়ে তিনি একদিন আয়েশা (রাঃ)-কে বলেন, لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُوْنَ، 'যদি তোমার কওম নওমুসলিম না হ'ত, তাহ'লে আমি কা'বা ভেঙ্গে দিতাম এবং এর দু'টি দরজা করতাম। একটি দিয়ে মুছল্লীরা প্রবেশ করত এবং অন্যটি দিয়ে বেরিয়ে যেত। কিন্তু কুরায়েশরা তা না করে অনেক উঁচুতে দরজা নির্মাণ করে। যাতে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ সেখানে প্রবেশ করতে না পারে। পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (৬৪-৭৩ হি.) সেটি করেন'।

(২) তিনি সাধ্যপক্ষে উম্মতের ঐক্য রক্ষার চেষ্টা করতেন। যেমন মুনাফিকদের অপতৎপরতা সীমা ছাড়িয়ে গেলে ওমর ফারূক (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, আমাকে অনুমতি দিন এই মুনাফিকটাকে (ইবনু উবাইকে) শেষ করে দিই। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, না। তাতে লোকেরা বলবে যে, মুহাম্মাদ তার সাথীদের হত্যা করছেন'।

(৩) তিনি লোকদের সাথে নম্র আচরণ করতেন। বৈঠকে তিনি কোনরূপ অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলতেন না। বেদুঈনদের রূঢ় আচরণে তিনি ধৈর্য অবলম্বন করতেন। বলা চলে যে, তাঁর এই বিনয়ী ব্যবহার ও অতুলনীয় ব্যক্তি মাধুর্যের প্রভাবেই রুক্ষ স্বভাবের মরুচারী আরবরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছিল। আল্লাহ বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِك ‘আর আল্লাহর রহমতেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের হ’তে, তাহ’লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত’ (আলে ইমরান ৩/১৫৯)। রাসূল (ছাঃ)-এর এই অনন্য চরিত্র মাধুর্য ছিল নিঃসন্দেহে আল্লাহর বিশেষ দান।

নবীজির মুজেজা:

যেমনিভাবে রাতের অন্ধকারের পর দিনের আলো আসাটা কুদরতি নিয়ম। ঠিক তেমনিভাবে এটাও আল্লাহতা’য়ালার ফয়সালা যে, যখন মানবজাতির ওপর পথভ্রষ্টতা ও গুমরাহির কালো আঁধার ছেয়ে যায়, তখন আল্লাহতা’য়ালা হেদায়েতের সূর্য উদিত করেন। মানবজাতিকে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য নবী-রাসুলদের আল্লাহতা’য়ালা নিজের প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেন। আল্লাহতা’য়ালা তাদের এমন কিছু অলৌকিক শক্তি দান করেন, যা সাধারণত মানুষকে দেন না। তাদের এমন চক্ষু দেওয়া হয়ে থাকে যা অন্য কাউকে দেওয়া হয় না। নবী-রাসুলগণ এমন কিছু দেখেন যা আমরা দেখি না। তারা এমন কিছু শোনেন যা আমরা শুনি না। মানুষের ফিতরি তাকাজা পূর্ণ করা ও তাদের অন্তরকে প্রশান্তি দেওয়ার জন্য নবী রাসুলদের থেকে এমন কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে যা সাধারণ মানুষের জন্য অসম্ভব। যেমন হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর জন্য আগুন ঠান্ডা হয়ে যাওয়া, হজরত মুসা (আ.)-এর লাঠি বিশাল বড় শাপ হয়ে যাওয়া, হজরত ঈসা (আ.)-এর পিতা ছাড়া জন্ম হওয়া এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক রাতে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা হয়ে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত ভ্রমণ করা এ সমস্ত ঘটনা মানুষের বিবেক দ্বারা বোঝা অসম্ভব। এগুলোকেই ইসলামী পরিভাষায় মুজেজা বলা হয়।

আমাদের নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, সর্বশেষ নবী হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক সময়ে ধরাতে আগমন করেছেন, যখন সারা দুনিয়া মূর্খতা ও গুমরাহির অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। তিনি (সা.) এই অন্ধকারকে একত্ববাদ ও ইসলামের আলোয় আলোকিত করে দিয়েছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু মুজেজা রয়েছে। ইমাম বাইহাকি (রহ.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজেজা হলো এক হাজার। ইমাম

নববী (রহ.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজেজা হলো এক হাজার ২০০। আবার অনেক মনীষী বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজেজা তিন হাজার। (সূত্র: ফতহুল বারি)। সর্বোপরি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসংখ্য-অগণিত মুজেজা রয়েছে। যা লিখে বা বর্ননা করে শেষ করা সম্ভব নয়। তথাপি পাঠকদের জন্য কিছু পেশ করার প্রয়াস করেছি।

কোরআন কারিম : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যতগুলো মুজেজা দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে সবচেয়ে বড় মুজেজা হলো 'আল কোরআন'। কাফেররা যখন নবীজির নিকট মুজেজা চেয়েছে তখন আল্লাহতা'য়ালা উত্তরে বলেন, 'তাদের কি এই নিদর্শন যথেষ্ট নয় যে, আমি মুহাম্মাদের ওপর এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা তিনি তাদেরকে পড়ে শোনানো হয়।' (সুরা আনকাবুত)। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'নবীদেরকে আল্লাহতা'য়ালা যেসব মুজেজা দান করেছেন সেগুলো দেখে মানুষরা তাদের ওপর ঈমান এনেছে। কিন্তু আল্লাহপাক আমাকে এমন এক মুজেজা দান করেছেন সেটা হলো কোরআন, যার দ্বারা আমি আশা করি কিয়ামতের দিন আমার অনুসারী সবচেয়ে বেশি হবে।' এই কোরআনের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, এর মতো করে একটি সুরাও কেউ রচনা করতে পারবে না।

হাদিস : কোরআনের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বড় মুজেজা হলো 'হাদিস'। কেননা যেই ব্যক্তি উম্মি তথা যিনি কখনো পড়েননি, লেখেননি বা দুনিয়ার কারো থেকে একটা শব্দও শেখেননি, এমন ব্যক্তির জবান মুবারক দিয়ে গঠনমূলক কথা ও বাণী কীভাবে নিঃসৃত হতে পারে? ইমান-আকিদা, লেনদেন, আচার-ব্যবহার, উত্তম চরিত্র গঠন, সামাজিক জীবন, পারিবারিক জীবন, আল্লাহর হক, মানুষের হক, দুনিয়া ও আখিরাত ইত্যাদি বিষয়ে এমন সব দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, যেগুলো সারা দুনিয়ার মানুষের ইহকাল ও পরকালের সফলতার মূল সনদে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কিয়ামত পর্যন্ত কোনো মানুষ যদি প্রিয় নবী সম্পর্কে জানতে চায়, তাহলে হাদিস থেকে খুব সুন্দরভাবে জানতে পারবে।

চন্দ্র দিখণ্ডিত হওয়া : একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনায় উপস্থিত ছিলেন। অনেক কাফেরও সেখানে উপস্থিত ছিল। কাফেররা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোনো অলৌকিক নিদর্শন দেখতে চাইল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বললেন, আসমানের দিকে তাকাও। তারা আসমানে তাকিয়ে দেখল, চাঁদ দুই টুকরা হয়ে গেছে। মাঝখানে পাহাড়। সমস্ত কাফের ভালো করে দেখার পর পুনরায় চাঁদ এক হয়ে গেছে। কিন্তু হতভাগা কাফেররা এই চাক্ষুষ মুজেজাকেও অস্বীকার করেছে।

বুবার নবুওয়াত স্বীকারোক্তি : এক নারী নবীজির নিকট তার এক যুবক ছেলেকে নিয়ে এসে বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমার ছেলে জন্ম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কথা বলেনি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, হে যুবক বলো আমি কে? সাথে সাথে সে বলে উঠল 'আপনি আল্লাহতা'য়ালার সত্য নবী।' (বাইহাকি শরিফ)।

আঙুলের মাথা দিয়ে পানি বের হওয়া : হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় পানি শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফলে এক হাজার ৫০০ মানুষ খুব পেরেশানিতে ও কষ্টে ছিল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক মগ পানি নিয়ে আসা হলে তার মাঝে নবীজি নিজের হাত মুবারক রেখে দিলেন। তখন নবীজির আঙুল থেকে ঝরনার মতো পানি বের হতে শুরু করে। এরপর সবাই ওজু করেন। পান করেন। নিজেদের প্রয়োজন সেরে নিজ নিজ পাত্রে রেখেও দিলেন। (বুখারি, তিরমিজি)

গাছ ও পাথরের সিজদা করা : শাম দেশের রাস্তায় এক খ্রিস্টান পাদ্রি থাকত। যখন আবু তালেবের কাফেলা সেখানে পৌঁছল, তখন সেই পাদ্রি দেখল রাস্তার উভয় পাশের গাছ ও পাথর সিজদারত অবস্থায় আছে। সে যেহেতু তাওরাত ও ইঞ্জিলের আলেম ছিল, তাই সে জানত যে গাছ, পাথর নবী ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করে না। সে কাফেলার কাছে এলো। সবাইকে দেখল। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর হাত ধরে সে বলল, 'তিনি শেষ নবী'।

গাছ এবং পাহাড়ের সালাম দেওয়া : হজরত আলী (রা.) বলেন, একদিন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মক্কার এক গলিতে যাচ্ছিলাম। আমি দেখলাম, যেই পাহাড় ও গাছ সামনে আসছে সেটা থেকেই শব্দ আসছে 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ'।

হালিমা সা'দিয়া (রা.)-এর উটনী ও ঘরে বরকত : হজরত হালিমা সা'দিয়া (রা.) বলেন, আমি যখন আমার এলাকার মহিলাদের সাথে মদিনায় যাচ্ছিলাম দুধপানকারী সন্তানের জন্য, তখন আমার উটনীটা ছিল একেবারে দুর্বল ও ক্ষীণকায়। যেটা সবার পেছনে চলছিল। কিন্তু যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাথে নিয়ে বাড়িতে ফিরছিলাম তখন উটনীটা সবল হয়ে গেল। সবার আগে দ্রুত গতিতে চলে আসল। তিনি আরো বলেন, আমার ঘরের বকরিগুলোতে দুধ খুব কম ছিল। একেবারে ছিল না বললেই চলে। কিন্তু যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে আসলেন তখন আমার বকরিগুলো দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এমন কি আমার প্রতিবেশীরা আমাকে বলতে লাগল, আমরাও তো একই জায়গায় বকরি চরাই। আমাদের বকরিগুলোতে তো এত দুধ আসে না।

গাছের কালিমায়ে তাওহিদ পড়া : হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সফরে ছিলেন। এক গ্রাম্যলোক নবীজির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছো? সে বলল বাড়িতে যাচ্ছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তোমার কি নেকির প্রয়োজন আছে? সে বলল, কী নেকি? নবীজি বললেন, কালিমা তাওহিদ বলো। সে বলল, এই কালিমার সাক্ষী আর কে দেয়? তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক গাছকে ডাক দিলেন। গাছ সাথে সাথে দৌড়ে নবীজির নিকট চলে এল। তিনি (সা.) ওই গাছকে বললেন, তুমি কালিমা বলো। সেই গাছ তিনবার কলিমা বলল। তখন ওই গ্রাম্যলোকটি বলল, আমি বাড়িতে গিয়ে সবাইকে নিয়ে আসব। আমরা সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করব। যদি সবাই না আসে তাহলে আমি একাই আপনার কাছে চলে আসব। (ইবনে সা'দ)।

এক দিনের বাচ্চার নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি : বিদায় হজের সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ইয়ামামাবাসীর এক ব্যক্তি এক বাচ্চা নিয়ে এল। যে বাচ্চা ওই দিনেই জন্মগ্রহণ করেছে। বাচ্চাকে দেখে নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে বাচ্চা বলো আমি কে? বাচ্চা সাথে সাথে বলে উঠল আপনি আল্লাহ তা'য়ালার সত্য নবী ও রাসুল।' প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি সত্য বলেছো। আল্লাহতা'য়ালা তোমার বয়সে বরকত দান করুন।